অর্থনীতিতে রাসূলের (সাঃ) দর্শন

শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

www.icsbook.info

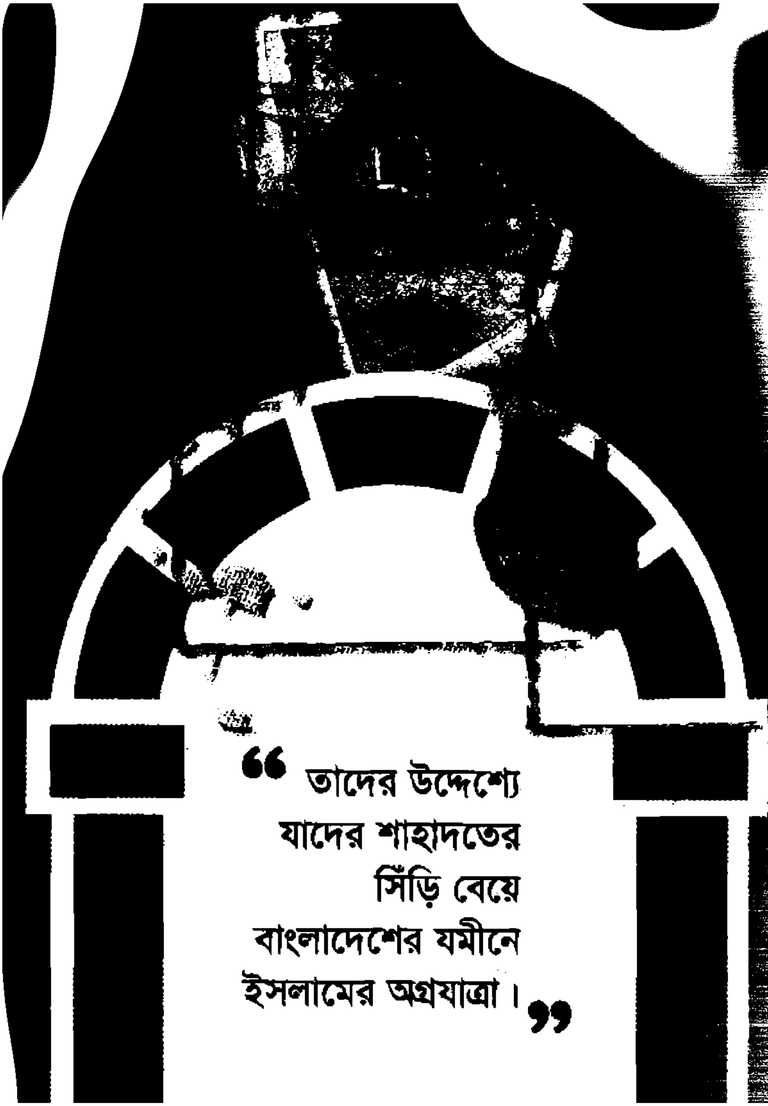

www.amarboi.org

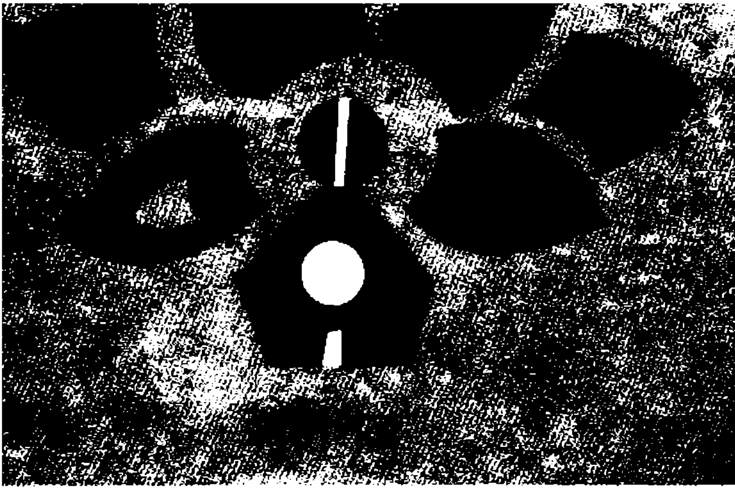

- ভূমিকা ৫
- হালাল উপায়ে উপার্জন ও হারাম পথ বর্জন ৮
- সুদ উচ্ছেদ ১৪
- ব্যবসায়িক অসাধুতা উচ্ছেদ ১৬
- যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন ১৮
- বায়তুলমালের প্রতিষ্ঠা ২৪
- মানবিক শ্রমনীতির প্রবর্তন ২৮
- ওশরের প্রবর্তন ও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ইসলামীকরণ ৩১
- উত্তরাধিকার ব্যবস্থার যৌক্তিক রূপদান ৩৫
- রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত হস্তক্ষেপের বিধান ৩৬
- সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন ৪০
- উপসংহার ৪২

www.amarboi.org

অর্থনীতিতে রাসুলের (সা.) দশ দফা

ভূমিকা

অর্থনীতি সমাজকাঠামো ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার অন্যতম মৌল ভিত্তি। যুগে যুগে বিশ্বের নানা অঞ্চলে যেসব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাদের প্রত্যেকেরই অর্থনৈতিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সমসাময়িক যুগে ছিল অবিশ্বাস্য। ঐসব সভ্যতার ক্ষমতাগর্বী শাসকগোষ্ঠী ও অমাত্যজন আল্লাহ্ ও তাঁর নবী-রাসুলদের শিক্ষা ভুলে সমাজে যে ভয়াবহ শোষণ ও নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়েছে তাও ইতিহাসের অংশ হয়ে রয়েছে। মিসরীয় সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, আসিরীয় সভ্যতাসহ পৃথিবীর সব উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সভ্যতা শ্রমশোষণ ও বিপুল জনগোষ্ঠীর অধিকার হরণেরও ইতিহাস। কালস্রোতে সেসব সভ্যতা বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু সেসবের প্রভাব ও আচরিত প্রথা বিলুপ্ত হয়নি। ফলে সমাজে অনাচার আর অত্যাচারের সয়লাব বয়ে গেছে। তাই নির্যাতিত মানবতা মুক্তির প্রহর গুণেছে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে কবে তাদের অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও হতাশা দূর হবে; শোষণের যাঁতাকল হতে কবে তারা নিষ্কৃতি পাবে?

রাজা বাদশাহ্ ও জমিদারের বিলাসিতার কড়ি যোগাতে না পারায় অগণিত বনি আদম বন্দীশালার হিমশীতল মেঝেতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। সুদের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাওয়া মানুষ ভিটেমাটি হতে উচ্ছেদ হয়েছে। যুগের পর যুগ নারীরা রয়ে গেছে সম্পত্তির অধিকার বঞ্চিত। ইয়াতীমরা হয়েছে সম্পত্তি হতে বিতাড়িত। সর্বনাশা জুয়ার খপ্পরে পড়ে অগণিত মানুষ হয়েছে সহায় সম্বলহীন। ব্যবসায়িক অসাধুতার কারণে জনসাধারণের জীবনে উঠেছে নাভিশ্বাস আর হারাম উপার্জনের জৌলুসের কাছে পরাস্ত হয়েছে মেহনতী মানুষের পূত পবিত্র অনাড়ম্বর জীবন। অমানিশার এই গাঢ় অন্ধকার দূর করতে আল-কুরআনের আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

নবুয়ত পূর্ব যুগের চল্লিশ বছরে রাসুলে আকরাম হযরত মুহাম্মদ (সা.) খুব ঘনিষ্ঠভাবে আরব ভূখন্ডের জনগণের জীবনধারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সমাজে বিরাজমান শোষণ নির্যাতন তাঁকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল। মুক্তির পথ খুঁজতে তিনি তাই হেরা গুহায় নিবিষ্ট মনে চিন্তা করেছেন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। তারপর এক শুভক্ষণে মহান রাব্বুল আ'লামীনের নির্দেশ নিয়ে

www.amarboi.org

আবির্ভূত হলেন হযরত জিবরাইল (আ.)। শুরু হলো মানব ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। মানবতার মুক্তির সনদ এখন রাসুলেরই (সা.) হাতে। কিন্তু তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবার পরিবর্তে প্রচন্ড বিরোধিতা করল মক্কার নেতারা, ক্ষমতার মসনদে আসীনরা। তাদের বিত্তবৈভবে এতটুকু ভাটা পড়ুক, দাসদের মুক্তি প্রদানের ফলে আয়েশী জীবনের ইতি ঘটুক, ইয়াতীমদের সম্পদ কুক্ষিগত করে ধনের পাহাড় গড়া বন্ধ হোক, সুদ প্রথা উচ্ছেদের মাধ্যমে বিনাশ্রমে অর্থাপয়ের পথ রুদ্ধ হোক এ তারা এতটুকুও বরদাশত করতে রাজী ছিল না। তাই রাসুলের (সা.) কর্মপ্রয়াস ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে এল। তাঁর জীবনের পরে হুমকি এল। দীর্ঘ তের বছর পরে রাসুল (সা.) হিজরত করলেন নতুন এক গন্তব্যের উদ্দেশ্যে - ইয়াসরেবে, আজকের মদীনা মুনাওয়ারায়।

মদীনায় তিনি একটি সুদৃঢ় ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার প্রয়াস চালান একেবারে শুরু হতেই। একই সময়ে সমাজদেহ হতে সকল অনাচার ও পঙ্কিলতা দূর করারও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যেহেতু একটি রাষ্ট্রের স্থায়ীত্ব ও সমৃদ্ধির বুনিয়াদ তাই এক্ষেত্রেও তিনি আল-কুরআনের আলোকে ঘোষণা করলেন দশ দফা কর্মসূচী। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মাত্র দশ বছরের মধ্যে শিশু ইসলামী রাষ্ট্রের যে বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটতে শুরু করেছিল তা ছিল সমকালীন বিশ্বের বিস্ময়। এরপর দীর্ঘ নয়শত বছর ধরে সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা দাপটের সাথে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। একই সংগে তাঁর ব্যতিক্রমী অর্থনৈতিক কর্মসূচীর কল্যাণস্পর্শে সমগ্র মানব জাতি নতুন এক সভ্যতার অভ্যুদয় লক্ষ্য করেছে। মাইকেল এইচ. হার্টের বিবেচনায় বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসের শতজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের শীর্ষতম ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.) বিদ্যমান অর্থনীতির কর্মপদ্ধতি, নীতি ও ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন এবং বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর অনুসৃত দশ দফা কর্মসূচীর বদৌলতেই সুদূর স্পেন হতে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল মুসলিম বিশ্বে শোষণমুক্ত ও কল্যাণধর্মী নতুন এক অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল।

প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার, দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে আল-কুরআন সমগ্র মানব জাতির জন্যে এক ঐশী গাইডবুক এবং মানবতার বন্ধু রাসুলে আকরাম (সা.) তার বাস্তব রূপকার। এক হাদীসে বলা হয়েছে রাসুল (সা.) এমন কোন কাজ করেননি, এমন কোন কথা বলেননি যাতে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের সম্মতি বা ইঙ্গিত ছিল না। এজন্যেই প্রখ্যাত সুফী সাধক ও দার্শনিক রূমী বলেন–

"মুহাম্মদ হারগিজ না গুফতা তা না গুফতা জিবরাইল
জিবরাইল হারগিজ না গুফতা তা না গুফতা কারদিগার।"

www.amarboi.org

অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.) কখনও কিছু বলেননি যতক্ষণ জিবরাইল (আ.) তাঁকে কিছু না বলেছেন। আর জিবরাইল (আ.) কিছু বলেননি যতক্ষণ না আল্লাহ পরওয়ারদিগার কিছু বলেছেন।

তাই অর্থনীতির ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাঁকে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি সেসবই বাস্তবায়নের জন্যে কর্মকৌশল উদ্ভাবন করেছেন, প্রয়োজনে রাষ্ট্রশক্তি পর্যন্ত প্রয়োগ করেছেন। প্রচলিত অর্থনীতিতে রাসূলে করীম (সা.) যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছিলেন আজকের যুগের দফার হিসেবে সেগুলিকে দশটি দফায় উল্লেখ করা যায়। এই দফাগুলি ছিল *আমর বিল মারুফ* ও *নেহী আনিল মুনকারের* সমন্বয়। এই কর্মসূচীর মাধ্যমেই তিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একাধারে সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির মূলোৎপাটন করেছিলেন। নীচে রাসূলের (সা.) গৃহীত সেই কর্মসূচী তথা দফাগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

প্রচলিত অর্থনীতিতে রাসূলে করীম (সা.) যে নতুন বিষয়গুলির প্রবর্তন করেছিলেন সেগুলি হলো–

১. হালাল উপায়ে উপার্জন ও হারাম পথ বর্জন
২. সুদ উচ্ছেদ
৩. ব্যবসায়িক অসাধুতা উচ্ছেদ
৪. যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন
৫. বায়তুলমালের প্রতিষ্ঠা
৬. মানবিক শ্রমনীতির প্রবর্তন
৭. ওশরের প্রবর্তন ও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ইসলামীকরণ
৮. উত্তরাধিকার ব্যবস্থার যৌক্তিক রূপদান
৯. ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিধান, এবং
১০. সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন।

উল্লেখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করলে বোঝা যাবে, এসব কর্মসূচী তৎকালীন অর্থনীতিকে কি প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল, বৈশিষ্ট্যের দিক হতে কি সুদূরপ্রসারী ও প্রগতিশীল চরিত্রের ছিল এবং দেশের আপামর জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নে কি বিপুল সহায়ক হয়েছিল। এই আলোচনা হতে বর্তমানে প্রচলিত অন্যান্য অর্থনৈতিক মতবাদের সঙ্গে ইসলামের অর্থনীতির মৌলিক পার্থক্যও সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। উপরন্তু ইসলামই যে বিশ্ব মানবতার একমাত্র মুক্তিসনদ একথা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করবে রাসুল (সা.) প্রদর্শিত এই বিশেষ পদক্ষেপগুলি।

www.amarboi.org

১. হালাল উপায়ে উপার্জন ও হারাম পথ বর্জন

ইসলামী বিধানে ব্যবহারিক জীবনে কিছু কাজকে হালাল বা বৈধ এবং কিছু কাজকে হারাম বা অবৈধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উৎপাদন, ভোগ ও বন্টনের ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য। ইসলামী বিধান অনুযায়ী যে কেউ স্বাধীন ও অবাধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারে। হালাল বা বৈধ পদ্ধতিতে যে কেউ উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। এ জন্যে সে পছন্দসই যেকোন উপায় ও পথ অবলম্বন করতে পারে। এর সাহায্যে যে কোন পরিমাণ অর্থও রোজগার করতে পারে। কিন্তু হারাম পদ্ধতিতে একটি পয়সাও উপার্জন করার অধিকার ইসলাম স্বীকার করেনি। ইসলাম-পূর্ব যুগে তো দূরের কথা, বর্তমান সভ্য যুগেও অন্যান্য মতাদর্শ বা ইজমভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উপার্জন, ভোগ ও বন্টনের ক্ষেত্রে এই বৈধতা বা হালাল-হারামের পার্থক্য নেই। সেখানে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থাৎ লাইসেন্স করে নিলে সব ধরনের উপার্জনের পন্থাই বৈধ। সরকারকে ধার্যকৃত কর ফি বা শুল্ক দিলেই যেকোন পরিমাণ আয়েই ব্যক্তির বৈধ মালিকানা স্বীকৃত হবে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদন, ভোগ ও বন্টনের ক্ষেত্রে কোন শেষসীমা বা বৈধ-অবৈধতার প্রশ্ন নেই। এমন কি যেসব পন্থায় উৎপাদন সমাজের জন্যে ক্ষতিকর ও যেসব পন্থায় ভোগ সমাজের জন্যে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সেসবও সমাজ ও অর্থনীতিতে অপ্রতিহতভাবে চলতে পারে। শর্ত শুধু লাইসেন্স করে নেওয়া বা নির্দিষ্ট হারে কর বা ফি ও শুল্ক নিয়মিত পরিশোধ করা। সমাজতন্ত্রের অবস্থাও প্রায় একই রকম। তফাৎ এই যে, সেখানে উপার্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও অতিমাত্রায় সীমিত। তবে ভোগের ক্ষেত্রে পার্টির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্যে এসব নিয়ন্ত্রণ সব সময়েই শিথিলযোগ্য। ইসলামে এই দুই ধরনের নীতির কোনটিই সমর্থন করা হয়নি। যা বৈধ ও যে পরিমাণ বৈধ তা সকলের জন্যেই সমভাবে বৈধ। অনুরূপভাবে যা নিষিদ্ধ তা সকলের জন্যেই সমভাবে নিষিদ্ধ।

বৈধ উপায়েও যে সম্পদ ও অর্থ অর্জিত হয় তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে একেবারে স্বাধীন ও বাধা-বন্ধনহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। হালালভাবে প্রাপ্ত বা উপার্জিত সম্পদ মাত্র তিন উপায়েই ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যথা-

১. বৈধ বা হালাল পন্থায় ভোগ;
২. বৈধ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ; এবং
৩. আল্লাহর পথে ব্যয়।

www.amarboi.org

বৈধ বা হালাল পন্থায় ভোগঃ মানুষ তার হালাল অর্জন অর্থাৎ সৎভাবে উপার্জিত অর্থ কেবলমাত্র বৈধ পন্থাতেই ব্যয় করতে পারবে। এমনকি *ইসরাফ* (অপচয়) ও *তাবযীর* (অপব্যয়) তার জন্যে নিষিদ্ধ। অপব্যয়কারীকে ইসলামে শয়তানের ভাই হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইসলামী সমাজে মানুষ তার বৈধ আয়ও এমনভাবে ব্যয় করতে পারবে না যা তার নিজের চরিত্রের ও সমাজের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে। অর্থাৎ, বৈধ পন্থায় আয়ও অবৈধ পন্থায় ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই। এজন্যে মদ্যপান, ব্যভিচার, নাচ-গান, রং-তামাসা, জুয়া-বাজী-লটারী, নৈতিকতাবিরোধী বিলাস-ব্যসন, সোনা-রূপার তৈজসপত্র ব্যবহার সবই নিষিদ্ধ। এসব নিষিদ্ধ পথ পরিত্যাগ করে নিজের ও পরিবার-পরিজনের জন্যে স্বাভাবিক ব্যয় নির্বাহ ও মধ্যম ধরনের জীবন যাপন করার জন্যেই রাসূল (সা.) তাগিদ দিয়েছেন।

বৈধ ব্যবসায়ে বিনিয়োগঃ নিজের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ও সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত ধন-সম্পদকে ব্যবসায়, কৃষি-শিল্প কিংবা এই ধরনের অন্যান্য অর্থকরী কাজে বিনিয়োগ করার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে। নিজের পক্ষে এককভাবে সম্ভব না হলে অন্যের সাথে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের অর্থাৎ মুদারিবাতের ভিত্তিতেও এই জাতীয় কাজে অর্থ বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। রাসুল (সা.) নিজে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করেছেন। ব্যবসায় সম্পর্কে তিনি বলেছেন-
"রুজীর দশ ভাগের নয় ভাগই রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে।"

(কানযুল আমল)

তিনি আরও বলেছেন-
"সত্যবাদী, ন্যায়পন্থী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী আম্বিয়া, সিদ্দীক ও শহীদদের সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে।" (তিরমিযী)

আল্লাহর পথে ব্যয়ঃ নিজস্ব ও পারিবারিক খরচ মিটিয়ে ও ব্যবসায়ে বিনিয়োগের পর উদ্বৃত্ত অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করাই উত্তম। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন-
"হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার উদ্বৃত্ত সম্পদ আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যয় কর তবে তা তোমার জন্যে উত্তম। আর যদি তা থেকে বিরত থাক তবে তাতে তোমার অকল্যাণ।" (তিরমিযী)

উপরে উদ্ধৃত হাদীস হতে একথাই প্রমাণ হয় যে উদ্বৃত্ত অর্থ আল্লাহর রাস্তায় দান করাই সবচেয়ে উত্তম। মুসলমান হিসেবে এভাবেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সা.) সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব।

www.amarboi.org

কোন ব্যক্তির আয় বা ব্যয় অথবা উভয়ই যদি অবৈধভাবে হয় তবে তার কাছ থেকে সমাজ ও দেশ মহৎ কিছু তো দূরে থাক, ভাল কিছুও আশা করতে পারে না। সে ব্যক্তি বরং সমাজের দুষ্টক্ষত। ক্রমেই যদি এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে দেশের বা জতির রাজনৈতিক আদর্শ যতই উত্তম হোক না কেন তার অধঃপতন অবধারিত। তাই ইসলামে আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈধতা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। নিষিদ্ধ বা হারাম করে দেওয়া হয়েছে সব ধরনের অবৈধ বা হারাম পথে আয় ও অবৈধ বা হারাম পথে ব্যয়। একজন মুসলিমের উপার্জন অবশ্যই হালাল বা বৈধ পন্থায় হতে হবে। কোনক্রমেই অবৈধ উপায়ে যেমন উপার্জন করা চলবে না তেমনি হালাল উপার্জনও অবৈধ পথে ব্যয় করা চলবে না।

সাধারণত: যেসব অবৈধ উপায়ে আয়ের পন্থা সমাজে চালু রয়েছে সেসবের মধ্যে ঘুষ, সুদ, হারাম পণ্যসামগ্রীর ব্যবসা, কালোবাজারী, চোরাকারবারী, নাচ-গান, ফটকাবাজী, পরদ্রব্য আত্মসাৎ, সব ধরনের প্রতারণা, ধাপ্পাবাজী, পতিতাবৃত্তি, সমস্ত প্রকারের লটারী, জুয়া প্রভৃতিই প্রধান। রাসুল (সা.) এসব হারাম ও অনৈতিক পথে উপার্জন কঠোরভাবে রোধ করেছেন। তৎকালীন সময়েই শুধু নয়, বর্তমান যুগেও অন্য কোনও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এত ব্যাপকভাবে অবৈধ ও অশ্লীল উপায়ে উপার্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। এ কারণেই সেসব মতাদর্শে সামাজিক দুর্নীতি ও অনাচারের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে।

হারাম উপায়ে উপার্জন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ মূখ্যতঃ তিনটি। প্রথমতঃ অবৈধ আয়ের উদ্দেশ্যে জনগণের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জুলুম করা হয়। হয়রানি করে বা কৌশলে প্রতারণা করে অথবা বাধ্য করে লোকদের নিকট থেকে ব্যক্তিবিশেষ বা অনেক সময় শ্রেণীবিশেষ উপার্জন করে থাকে। এতে জনগণ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি সমাজে সৃষ্টি হয় অসন্তোষ। দরিদ্র ও সাধারণ লোক তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হতে হয় বঞ্চিত। উপরন্তু কলহ বিশৃংখলা বিদ্বেষ ও বিভেদ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হয়। অনেক সময়ে ব্যক্তিবিশেষও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে অবৈধ অর্থ ব্যয় করে থাকে। যেমন উৎকোচ বা ঘুষ। বিশ্বের সর্বত্রই এটা সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। বহু দেশে সামরিক আইন পর্যন্ত চালু করা হয়েছে ঘুষ উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকেই ঘুষ নিতে দেখা গেছে। ঘুষ বা 'উপরি আয়' আজ অন্য আর দশটা উপায়ে আয়ের মতোই খুব সহজ ও স্বাভাবিক বলে স্বীকৃত হচ্ছে। কিন্তু যারা ঘুষ নেয় বা দেয় তাদের উদ্দেশ্যে রাসুলে করীম (সা.) সর্তক করে দিয়ে বলেন-

"ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষ প্রদানকারী উভয়েরই উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।"

(বুখারী, মুসলিম)

www.amarboi.org

দ্বিতীয়তঃ চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টকারী বিষয় যেমন নৃত্য সঙ্গীত মদ বেশ্যাবৃত্তি সবধরনের অশ্লীল কাজ ইসলামী সমাজে নিষিদ্ধ। এসবের ব্যবসা করাও তাই নিষিদ্ধ। সমাজে এসব কাজের এতটুকুও প্রশ্রয় দিলে অশ্লীলতা বেহায়াপনা কলুষতা ছড়িয়ে পড়বে। এর বিষবাষ্প প্রবেশ করবে সমাজ ও রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ফলে চরিত্র হননের সীমা থাকবে না। গোটা সমাজ পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হবে। সেজন্যেই এসব জিনিষের ভোগ শুধু নিষিদ্ধই নয়, এসবের শিল্প-কারখানা তৈরী করা ও ব্যবসা করা অর্থাৎ এ সমস্ত উৎস হতে উপার্জন করাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

তৃতীয়তঃ অবৈধ উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদ সাধারণতঃ অবৈধ কাজেই ব্যয় হয়। অবৈধ কাজে ব্যয়ের পরিণাম ফল হচ্ছে সামাজিক অনাচার ও পংকিলতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অবৈধ ও অসৎ উপায়ে যারা আয় করে থাকে তারা সে আয় নানা সমাজবিরোধী তথা ইসলামী অনুশাসনবিরোধী কাজে ব্যয় করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ নাচ-গান, সিনেমা, নানা রংতামাশা, বিলাস-ব্যসন, মদ্যাসক্তি, বেশ্যাগমন, প্রাসাদোপম বাড়ী তৈরী প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এর যেকোন একটিই সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট। যদি এর সবগুলিই কোন সমাজ বা জাতির মধ্যে ক্রমে ক্রমে অনুপ্রবেশ করে তাহলে গোটা সমাজ ও জাতির চূড়ান্ত সর্বনাশ হবে। এজন্যেই মানবতার মুক্তিদূত রাসূল (সা.) কঠোরভাবে অবৈধ উপায়ে উপার্জনের সকল পথ রুদ্ধ করেন। তিনি বলেন, হারাম উপায়ের উপার্জনে তৈরী রক্তমাংস দোযখের খোরাক হবে।

অপব্যয়ের ছিদ্রপথেই সংসারে আসে অভাব-অনটন। সমাজে আসে অশান্তি। অশান্তি আর অনটন হতে রক্ষা পেতে হলে মিতব্যয়ীতাই হওয়া উচিৎ আদর্শ। কৃপণতা যেমন অনাকাংখিত, অপব্যয়ও তেমনি অনভিপ্রেত। এ দুয়ের মধ্যবর্তী পথই হচ্ছে উত্তম পথ। অর্থাৎ, মিতব্যয়ীতাই উত্তম পথ। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

"তারাই আল্লাহর নেক বান্দা যার অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে না অপচয় ও বেহুদা খরচ করে, না কোনরূপ কৃপণতা করে। বরং তারা এ উভয় দিকের মাঝখানে মজবুত হয়ে চলে।" (সুরা আল-ফুরকানঃ ৬৭ আয়াত)

বাস্তবিকই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তথা সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনে আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সততা ও মধ্যম পন্থা অনুসরণ করে চললে সুষ্ঠু ও সাবলীল উন্নতি হতে পারে। বস্তুতঃ পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও ক্রমবর্ধমান সামাজিক অনাচার ও পাপাচারের মুখ্য কারণ শরীয়াহবিরোধী পন্থায় আয় ও ব্যয়। এজন্যেই রাসূল (সা.) এর মূলোচ্ছেদ করেছিলেন।

www.amarboi.org

প্রসঙ্গতঃ ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের দায়িত্বের কথাও উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তি মানুষের অপরাধ প্রবণতা যদি আল্লাহর ভয়ে ও রাসুলের (সা.) সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সংশোধিত না হয় তাহলে সরকার অবশ্যই ইসলামী আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম ব্যবস্থা হচ্ছে, যাদের হাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ রয়েছে তাদের সেসব সম্পত্তি বৈধ বা জায়েজ পথে অর্জিত হয়েছে কিনা তা নির্ণয় করা। এ উদ্দেশ্যেই মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এর নির্দেশে *হিসবাহ* নামে একটি দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দপ্তরটির কাজ ছিল অবৈধ উপায়ে আয় রোধ করা, এ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা এবং এ জাতীয় আয় কারো হক বা অধিকার হরণ করার ফলে হয়ে থাকলে তা মূল মালিকের কাছে প্রত্যর্পণ করা। যদি তা সম্ভব না হয় বা সেভাবে আয় না হয়ে থাকে তবে তা বায়তুলমালেই জমা করে দেওয়া হতো।

হারাম আয়ের বড় একটি উৎস হলো জুয়া। আজ যেমন সর্বত্র নানা ধরনের জুয়া চলছে, তেমনি অতীতেও এর প্রচলন ছিল। জুয়ার ইতিহাস বহু প্রাচীন। জুয়ার কবলে পড়ে কত অসংখ্য পরিবার যে সর্বস্বান্ত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। শিল্প বিপ্লবের পর জুয়ার আরও চমকপ্রদ ও নতুন নতুন কৌশল আবিস্কৃত হয়েছে। পূর্বে জুয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল তীর ও পাশার খেলা। পরবর্তীতে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘোড়দৌড়, তাসের বিভিন্ন খেলা, হাউজী, রুলেতে, শব্দচয়ন, লটারী, প্রাইজবন্ড ইত্যাদি নানা ধরনের ও কৌশলের জুয়া। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফটকাবাজী। ফটকাবাজী সম্পূর্ণতঃ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবদান। শেয়ার মার্কেটে সম্ভাব্য মুনাফার চটকদার হিসেব দেখিয়ে ও অন্যান্য অপকৌশলের মাধ্যমে শেয়ার বিকিকিনির ফলে কত পরিবার যে রাতারাতি নিঃস্ব হয়েছে তার হিসেব নেই। বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেট তার জাজ্বল্যমান নজীর। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র এর ব্যতিক্রম নয়।

জুয়াকে তাই ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ধোঁকাবাজী বা প্রতারণার ঘোর শত্রু ইসলাম। প্রচলিত সমাজ জীবনে আজ জুয়া যেমন মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে, ইসলামের আবির্ভাবের যুগেও তেমনি ছিল। জুয়ার খপ্পরে পড়লে নিরীহ মানুষের দুর্দশার সীমা-পরিসীমা থাকে না। কিন্তু একদল লোক এরই মাধ্যমে বিপুল অর্থ উপার্জন করে থাকে। ইসলামে এজন্যে সব ধরনের জুয়াকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল-কুরআনে আল্লাহতায়ালা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন-

www.amarboi.org

"হে মুমিনগণ! জেনে রাখ, মদ জুয়া মূর্তি এবং (গায়েব জানার জন্যে) পাশা খেলা, ফাল গ্রহণ ইত্যাদি অতি অপবিত্র জিনিষ ও শয়তানের কাজ। অতএব, তোমরা তা পরিত্যাগ কর। তবেই তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে"।

(সুরা আল-মায়েদাঃ ৯০ আয়াত)

রাসুলে করীম (সা.) বলেছেনঃ
"যে ব্যক্তি ধোঁকাবাজী করে সে আমার তরিকার লোক নয়।" (সিহাহ সিত্তাহ)

যে সব কারণে ইসলামে জুয়া ও ফটকাবাজারী নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে-

অর্থ ও সময়ের অপচয় ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে আল্লাহ নিজেই বলেছেন অপব্যয়কারীগণ শয়তানের ভাই। সুতরাং, জুয়ার মাধ্যমে অর্থের অপব্যয় করে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ তাঁর অভিশপ্ত শয়তানের ভাই হোক কোনক্রমেই তা কাম্য হতে পারে না। ঘোড়ার দৌড়, শব্দচয়ন, তাসের খেলা, লটারী ইত্যাদি দ্বারা কত যে অর্থের ও সময়ের অপচয় হয় তার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তাছাড়া জুয়া নেশার মতো। একবার এর খপ্পরে পড়লে এ থেকে বাঁচা দায়। একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পথে না দাঁড়ানো পর্যন্ত অনেক লোকই এর হাত হতে নিষ্কৃতি পায়নি। শুধু মাত্র ঘোড়ার রেসেই কত লোক সর্বস্ব খুইয়েছে তার হিসেব করা শক্ত। বাংলাদেশ পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বহু দেশেই আজ ঘোড়ার রেস তাই শুধু নিষিদ্ধই নয়, সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক বিশৃংখলা ও অপরাধ সৃষ্টিকারী ঃ শুধুমাত্র জুয়ায় হার-জিতের কারণেই মানুষের মধ্যে কলহ ফাসাদ, মারামারি এবং শেষ পর্যন্ত খুন-জখম সংঘটিত হচ্ছে এরকম নজীর ভুরি ভুরি। আমাদের দেশেও বড় বড় শহরের লঞ্চ বা রেলস্টেশনের ধারেই দেখা যাবে নানান ধরনের জুয়ার ফাঁদ পেতে বসে রয়েছে এক শ্রেণীর লোক। শহরগামী গ্রামের নিরীহ মানুষ এদের ফাঁদে পা দিয়ে সমস্ত টাকাকড়ি খুইয়ে বসে। জুয়ার আড্ডা হতে ফাঁসির মঞ্চে পৌঁছে গেছে এমন দৃষ্টান্ত শুধু বিদেশে নয়, আমাদের দেশেও অভাব নেই। বিদ্বেষ মারামারি নৈরাজ্য ইত্যাদি সামাজিক অনাচার সৃষ্টি করার বা উস্কে দেবার বিশেষ গুণ রয়েছে জুয়ার।

বিপুল প্রতারণা ঃ জুয়ার মাধ্যমে মুষ্টিমেয় লোক বহু লোককে প্রতারণা করে বিনাশ্রমে বিপুল অর্থ উপার্জন করে। পূর্বেই বলা হয়েছে, যাবতীয় অবৈধ উপায়ে আয় ইসলামে সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। জুয়ার মাধ্যমে উপার্জনও তাই নিষিদ্ধ। জুয়ার দ্বারা কৌশলে অল্প সময়ে বিনা আয়াসে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা সম্ভব বলে একদল লোক যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও হালালভাবে আয়ের চেষ্টা করে না। উপরন্তু জুয়ার মাধ্যমে তারা সামাজিক দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

www.amarboi.org

২. সুদ উচ্ছেদ

সমাজ হতে দুর্নীতির অবসান ও জুলুমতন্ত্রের বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম ও সর্বপ্রধান যে মোক্ষম আঘাতটি হানা হয়েছে তা হচ্ছে সুদের উচ্ছেদ। সুদ ও সুদভিত্তিক সমস্ত কারবার ও লেনদেন চিরকালের জন্যে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আল-কুরআনে এ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে-

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"
(সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৫ আয়াত)

রাসূলে করীম (সা.) বলেন-
" তোমাদের মধ্যে যারা সুদ খায়, সুদ দেয়, সুদের হিসাব লেখে এবং সুদের সাক্ষ্য দেয় তারা সবাই সমান পাপী।" (তিরমিযী, মুসলিম)

ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় যাবতীয় অসৎ কাজের মধ্যে সুদকে সবচেয়ে পাপের জিনিস বলে গণ্য করা হয়েছে। বস্তুতঃ সুদের মতো সমাজবিধ্বংসী অর্থনৈতিক হাতিয়ার আর দুটি নেই। সুদের কুফলগুলির প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে কেন সুদ চিরতরে হারাম ঘোষিত হয়েছে।

সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম ঃ একদল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহায্যেই। ঋণগ্রহীতা যে কারণে টাকা ঋণ নেয় সে কাজে তার লাভ হোক বা না হোক সুদের অর্থ তাকে শোধ করতেই হবে। এর ফলে বহু সময়ে ঋণগ্রহীতাকে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে হলেও সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। সুদ গ্রহীতারা হচ্ছে সমাজের পরগাছা। এরা অন্যের উপার্জন ও সম্পদে ভাগ বসিয়ে জীবন যাপন করে। সমাজের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এদের কোন অবদান থাকে না।

দরিদ্র আরও দরিদ্র এবং ধনী আরও ধনী হয় ঃ দরিদ্র অভাবগ্রস্ত মানুষ সাহায্যের কোন দরজা খোলা না পেয়ে, উপায়ন্তর না দেখে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। সেই ঋণ অনুৎপাদনী ও উৎপাদনী- দু রকম কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে অনুৎপাদনী কাজে ঋণের অর্থ ব্যবহারের ফলে তার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাই লোপ পায়। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে করযে হাসানার কোন সুযোগ না থাকায় অনুৎপাদনী খাতে তো দূরের কথা, উৎপাদনী খাতেও বিনা সুদে ঋণ মেলে না। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো তাকে সুদ শোধ করতে হয়। ফলে সে তার শেষ সম্বল যা থাকে তাই বিক্রি করে উত্তমর্ণের ঋণ শুধরে থাকে। এই বাড়তি অর্থ

www.amarboi.org

পেয়ে উত্তমর্ণ আরও ধনী হয়। একই সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য।

ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ঃ কৃষকেরা ফসল ফলাবার তাগিদে নিজেরা খেতে না পেলেও ঋণ করে জমি চাষ করে থাকে। এই ঋণ শুধু যে গ্রামের মহাজনের কাছ থেকেই নেয় তা নয়, বিভিন্ন এনজিও ও সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকেও নেয়। যথোপযুক্ত বা আশানুরূপ ফসল হওয়া সব সময়েই অনিশ্চিত। তাছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্বিপাক তো রয়েছেই। যদি ফসল আশানুরূপ না হয় বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ফলে ফসল খুবই কম হয় বা মোটেই না হয় তবু কিন্তু কৃষককে নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদসহ ঋণ শোধ করতে হবে। তা না পারলে কি মহাজন, কি ব্যাংক - সকলেই আদালতে নালিশ ঠুকে কৃষকের সহায়-সম্পত্তি ক্রোক করিয়ে নেবে। নীলামে চড়াবে দেনার দায়ে। এভাবেই বিশ্বের সমস্ত পুঁজিপতি দেশে ক্ষুদ্র চাষীরা ক্রমেই ভূমিহীন চাষী হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

একচেটিয়া কারবারের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায় ঃ বড় বড় ব্যবসায়ীরা যে শর্তে ও যে সময়ের জন্যে ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ পেতে পারে, ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা সেভাবে ঋণ পায় না। এজন্যে প্রতিযোগিতার তারতম্য ঘটে। সে প্রতিযোগিতায় বিশেষ সুবিধা ভোগের সুযোগ নিয়ে বড় কারবারী বা ব্যবসায়ী আরও বড় হয়। কিন্তু ছোট কারবারী বা ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ধ্বংস হয়ে যায়। বৃহদায়তন শিল্প বা কারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাই। এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শুধু ব্যাংকই নয়, পুঁজিপতি ও অনৈসলামী সরকারসমূহ যে বিশেষ সুবিধা ও ন্যূনতম সুদের হারে টাকা ঋণ দিয়ে থাকে, ছোট বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্যে আদৌ সে সুযোগ নেই। ফলে বড় শিল্পপতিরা প্রতিযোগিতাহীন বাজারে একচেটিয়া কারবারের সমস্ত সুযোগ লাভ করে। পরিণামে সামাজিক বৈষম্য আরও প্রকট হয়।

দ্রব্যমূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পায় ঃ সুদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী উৎপাদন খরচের উপর পরিবহন খরচ, শুল্ক (যদি থাকে) এবং স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে পণ্যসামগ্রীর বিক্রি মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে দ্রব্যের এই স্বাভাবিক মূল্যের উপর উপর্যুপরি সুদ যোগ করে দেওয়া হয়। দ্রব্যবিশেষের উপর তিন থেকে চার বার পর্যন্ত, ক্ষেত্রবিশেষে তারও বেশীবার সুদ যোগ হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্পের কথাই ধরা যেতে পারে। এই শিল্পের তুলা আমদানীর জন্যে আমদানীকারকের কাছ হতে ব্যাংক দেয় ঋণের জন্যে যে সুদ নেয় তা যুক্ত হয় তুলার উপর। ঐ তুলা থেকে সূতা তৈরীর জন্যে কারখানা যে ঋণ নেয় ব্যাংক হতে তার সুদও যুক্ত হয় সূতার উপর।

www.amarboi.org

পুনরায় ঐ সূতা হতে কাপড় তৈরীর সময়ে বস্ত্রকল যে ঋণ নেয় তার সুদও যুক্ত হয় কাপড়ের উপর। এরপর কাপড়ের পাইকারী বিক্রেতা তার ব্যবসার উদ্দেশ্যে যে ঋণ নেয় তার সুদও যোগ করে ঐ কাপড়ের কারখানা মূল্যের উপর। এভাবে চার পর্যায়ে সুদের অর্থ যুক্ত হয়ে কাপড় যখন খুচরা দোকানে আসে, বা প্রকৃত ভোক্তা ক্রয় করে তখন সে আসল মূল্যের চেয়ে বহু গুণ বেশী দাম দিয়ে থাকে। এমনিভাবে সমাজে দৈনন্দিন জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রত্যেকটিতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুদ জড়িয়ে আছে। নিরুপায় ভোক্তাকে বাধ্য হয়েই সুদের জন্যে সৃষ্ট এই চড়া মূল্য দিতে হয়। কারণ, সুদনির্ভর অর্থনীতিতে এছাড়া তার গত্যন্তর নেই। এ থেকেই বোঝা যায় ব্যক্তি, সমাজ ও অর্থনীতির জন্যে সুদ কত মারাত্মক।

এরই বিপরীতে ইসলামী অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হলে বিনিয়োগের জন্যে যেমন অর্থের অব্যাহত চাহিদা থাকবে তেমনি সঞ্চয়েরও সদ্ব্যবহার হবে। ফলে নতুন নতুন কল-কারখানা স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও সম্পদের পূর্ণবন্টন ঘটবে। তাছাড়া প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। একচেটিয়া কারবার হ্রাস পাবে। অতি মুনাফার সুযোগ ও অস্বাভাবিক বিনিয়োগ প্রবণতা দূর হবে। এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন ও সব ধরনের শোষণের পথ বন্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যেই ইসলামে সুদকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

৩. ব্যবসায়িক অসাধুতা উচ্ছেদ

সর্বপ্রকার ব্যবসায়িক অসাধুতা ইসলামী অর্থনীতিতে শুধু নিন্দনীয়ই নয়, কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বর্তমান বিশ্বে, বিশেষতঃ পুঁজিবাদী ও আধাপুঁজিবাদী দেশসমূহে ব্যবসায়িক অসাধুতার জন্যে প্রকৃতপক্ষে কোন শাস্তি নেই। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে স্ব স্ব দেশের সরকার হয় খুবই উদার মনোভাব গ্রহণ করে থাকে, নয়তো তাদের দমন করা বা শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা সরকারের নেই। শুধু কালোবাজারী বা চোরাকারবারই ব্যবসায়িক অসাধুতা নয়, মজুতদারী, ওজনে কারচুপি, ভেজাল দেওয়া, নকল করা, প্রতারণামূলক অনৈতিক বিজ্ঞাপণ প্রচার প্রভৃতিও জঘন্য ধরনের অপরাধ।

অধিক লাভের আশায় পণ্য মজুত রাখা বর্তমান বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কোন অপরাধ নয়। অথচ এর ফলে পণ্যমূল্য বেড়ে যায় হু হু করে। জনসাধারণের দুঃখ কষ্টের সীমা থাকে না। কিন্তু একচেটিয়া কারবারের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন। সে যেকোন প্রকারেই হোক না কেন। আমাদের দেশেও দেখা যাবে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী মৌসুমের শুরুতেই ধান-চাল, পিঁয়াজ, রসুন,

www.amarboi.org

সবরকমের ডালসহ নানারকম শস্য বিপুল পরিমাণে গুদামজাত করে রাখে। ফলে বাজারে সৃষ্টি হয় কৃত্রিম সংকট। দাম বেড়ে যায় দ্রুত। এই সুযোগে বিপুল অর্থ উপার্জন করে মজুতদার। একইভাবে শিল্পজাত পণ্যেরও মজুতদারী চলে। সাবান টুথপেস্ট শিশুখাদ্য সিমেন্ট সার সূতা চিনি ভোজ্যতেল কাগজ টিন- হেন বস্তু নেই যা ব্যবসায়ীরা মজুত করে না। তার পরিমাণ এত বেশী যে বাজারে কৃত্রিম সংকট দেখা দেবেই। সৃষ্টি হবে এক দুঃসহ অস্বাভাবিক অবস্থা। সাধারণ মানুষ তখন এদের কৃপার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এই ধরনের অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে বারবার।

এর প্রতিবিধানের উদ্দেশে রাসূলে করীম (সা.) পণ্য মজুত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন-

"যে ব্যক্তি ইহতিকার করবে অর্থাৎ, অতিরিক্ত দামের আশায় চল্লিশ দিন যাবৎ খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় না করে আটক রাখবে আল্লাহর সঙ্গে তার ও তার সঙ্গে আল্লাহর সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।" (মুসনাদে আহমদ)

মজুতদারী বা ইহতিকার সম্পর্কে তিনি আরও বলেন- "খাদ্যশস্য মজুতকারী ব্যক্তির মনোভাব অত্যন্ত বীভৎস ও কুটিল। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস হলে তারা চিন্তিত হয়ে পড়ে আর মূল্য বৃদ্ধি পেলে তারা আনন্দিত হয়।" (মুসলিম)

পরিমাপে কারচুপি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ওজনে বা মাপে কম দেওয়ার প্রবণতা ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মতো প্রসার লাভ করেছে। পরিমাপে প্রতারণার জন্যে জনসাধারণ উচিৎ মূল্য দিয়েও যথোচিত পরিমাণ সামগ্রী হতে বঞ্চিত হয়। অথচ ব্যবসায়ী শ্রেণী অবৈধ উপায়ে আয়ের মাধ্যমে আরও সম্পত্তি অর্জন করে। এ দেশের যেকোন সরকারী ক্রয়কেন্দ্রে আখ, পাট বা ধানের ওজন এবং সাধারণ আড়তদারের কলাই মসুর হলুদ সরিষা চাল আলু শাক-সবজী প্রভৃতির ওজন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কিভাবে কৃষকদের প্রতারণা করা হয়। ওজনে ফাঁকি দেওয়া বা ইচ্ছাকৃতভাবে ওজনে কম দেওয়া এসব জায়গায় স্বীকৃত ও স্বাভাবিক ব্যাপার বলে গণ্য। প্রতিবাদ করলে আরও নাজেহাল হতে হয়। পণ্য সামগ্রী নিম্নমানের, ভিজা, সময় পার হয়ে গেছে ইত্যাদি নানা মিথ্যা ও বানোয়াট অজুহাতে তাদের হয়রানির চূড়ান্ত করা হয়।

এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-
"তোমরা মাপে ঠিক দাও এবং কারো ক্ষতি করো না, সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ঠিকমত ওজন কর। লোকদের পরিমাপে কম বা নিকৃষ্ট কিংবা দোষযুক্ত জিনিস দিও না এবং দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না।"

www.amarboi.org

(সুরা আশ-শুয়ারাঃ ১৮১-১৮৩ আয়াত)

মজুতদারী থেকে যেমন মুনাফাখোরী মানসিকতার সৃষ্টি হয়, তেমনি ব্যবসায়িক অসাধুতা হতেই নৈতিকতাবিরোধী মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। এ জন্যেই দেশে দেশে কালোবাজারী ও চোরাকারবার সংঘটিত হচ্ছে। দেশপ্রেম বা জনগণের স্বার্থ এদের কাছে কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। যেভাবেই হোক না কেন, অধিক হতে অধিকতর মুনাফা অর্জনই এদের একমাত্র লক্ষ্য। বৈষয়িক উন্নতির জন্যে এরা নৈতিকতাকে কুরবানী করেছে। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, চোরাকারবার যেমন দেশের অর্থনৈতিক ধ্বংস ডেকে আনে কালোবাজারীও তেমনই সামাজিক অবক্ষয়ের গতি ত্বরান্বিত করে। এরই প্রতিবিধানের জন্যে রাসূলে করীম (সা.) মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে *হিজর* নামে এক দপ্তরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দপ্তরের কাজ ছিল ব্যবসায়ে অসাধুতা নিয়ন্ত্রন করা এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের দোকানপাট বা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের পরিচালনায় নিয়ে আসা। খুলাফায়ে রাশেদীন (রা.) পর্যন্ত এ ব্যবস্থা বহাল ছিল।

৪. যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন

যাকাত ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি। আল-কুরআনে বারংবার নামায কায়েমের পরই যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের নির্দেশেই যাকাত আদায়ের ব্যাপারে রাসূলে করীম (সা.) সাহাবীগণকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং এজন্যে একটা প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। কেন যাকাতের এই গুরুত্ব? ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদ বন্টন তথা সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবেই যাকাত গণ্য হয়ে থাকে। সমাজে আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হ্রাসের জন্যে যাকাত একটি অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার। যাকাতের সঙ্গে প্রচলিত অন্যান্য সব ধরনের করের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কারণ, ইসলামের এই মৌলিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একাধারে নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মূল্যবোধ অন্তর্নিহিত রয়েছে। কিন্তু সাধারণ করের ক্ষেত্রে কোন নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক তাগিদ নেই।

যাকাত ও প্রচলিত করের মধ্যে অন্ততঃ চারটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যথাঃ

প্রথমতঃ নির্দিষ্ট আয়ের বিপরীতে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে নির্ধারিত হারে কর প্রদান করতে হয়। এ জন্য করদাতা কোন প্রত্যক্ষ উপকার প্রত্যাশা করতে পারে না। সরকার করের মাধ্যমে অর্জিত এই অর্থ দরিদ্র ও অভাবী জনসাধারণের মধ্যে ব্যয়ের জন্যে বাধ্য থাকেন না। পক্ষান্তরে যাকাত হিসেবে আদায়কৃত অর্থ অবশ্যই

www.amarboi.org

আল-কুরআনে নির্দেশিত লোকদের মধ্যেই বন্টন করতে বা তাদের জন্যেই ব্যবহৃত হবে।

দ্বিতীয়তঃ যাকাতের অর্থ রাষ্ট্রীয় সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ব্যয় করা যাবে না। কিন্তু করের অর্থ যেকোন কাজে ব্যয়ের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা সরকারের রয়েছে।

তৃতীয়তঃ যাকাত প্রদান শুধুমাত্র বিত্তশালী বা সাহেবে নিসাব মুসলিমদের জন্যেই বাধ্যতামূলক। কিন্তু কর বিশেষতঃ পরোক্ষ কর, সর্বসাধারণের উপর আরোপিত হয়ে থাকে। অধিকন্তু প্রত্যক্ষ করেরও বিরাট অংশ জনসাধারণের উপর কৌশলে চাপিয়ে দেওয়া হয়।

চতুর্থতঃ যাকাতের হার পূর্ব নির্ধারিত এবং স্থির। কিন্তু করের হার স্থির নয়। যে কোন সময়ে সরকারের ইচ্ছানুযায়ী করের হার ও করযোগ্য বস্তু বা সামগ্রীর পরিবর্তন হয়ে থাকে। সুতরাং, যাকাতকে কোনক্রমেই প্রচলিত অর্থে সাধারণ কর হিসেবে গণ্য করা যায় না বা তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না।

ইসলামী শরীয়াহ অনুসারে যে সমস্ত সামগ্রীর উপর যাকাত ধার্য হয়েছে সেগুলি হলো-

১. ব্যাংকে/ হাতে সঞ্চিত/ জমাকৃত অর্থ;
২. সোনা, রূপা, এবং সোনা-রূপা দ্বারা তৈরী অলংকার;
৩. ব্যবসায়ের পণ্য সামগ্রী;
৪. জমির ফসল;
৫. খনিজ উৎপাদন; এবং
৬. সব ধরনের গবাদি পশু।

উপরোক্ত দ্রব্য সামগ্রীর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ যখন কোন মুসলমান অর্জন করে তখন তাকে যাকাত দিতে হয়। এই পরিমাণকে *নিসাব* বলে। নিসাবের সীমা বা পরিমাণ দ্রব্য হতে দ্রব্যে ভিন্নতর। একইভাবে যাকাতের হারও দ্রব্য হতে দ্রব্যে ভিন্নতর। যাকাতের সর্বনিম্ন হার শতকরা ২.৫%।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকাত কাদের প্রাপ্য অর্থাৎ কাদের মধ্যে যাকাতের অর্থ বন্টন করে দিতে হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন-

"দান-খয়রাত তো পাওনা হলো দরিদ্র ও অভাবীগণের, যে সকল কর্মচারীর উপর আদায়ের ভার আছে তাদের, যাদের মন (সত্যের প্রতি) সম্প্রতি অনুরাগী হয়েছে,

www.amarboi.org

গোলামদের মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্যে। এটি আল্লাহর তরফ হতে ফরয এবং আল্লাহ সব জানেন ও বুঝেন।"

(সুরা আত-তাওবাঃ ৬০ আয়াত)

উপরের আয়াত হতে আট শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যাকাতের অর্থ ব্যবহারের জন্যে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। সেগুলি হচ্ছে:

১. দরিদ্র জনসাধারণ;
২. অভাবী ব্যক্তি;
৩. যে সকল কর্মচারী যাকাত আদায়ে নিযুক্ত রয়েছে;
৪. নও-মুসলিম;
৫. ক্রীতদাস মুক্তি;
৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি;
৭. আল্লাহর পথে, এবং
৮. মুসাফির।

এই আটটি খাতের মধ্যে ছয়টিই দারিদ্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অন্য দুটি খাতও (৩ ও ৭) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যাকাত আদায় ও ব্যবস্থাপনা একটি কঠিন ও শ্রমসাপেক্ষ কাজ। এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এটাই সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। সুতরাং, তাদের বেতন এই উৎস হতেই দেওয়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া যেসব ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামে লিপ্ত তারাও অন্য কোনভাবে জীবিকা অর্জনের সুযোগ হতে বঞ্চিত। সুতরাং, উপরে বর্ণিত আটটি খাতেই যদি যাকাতের অর্থ ব্যয় হয় তাহলে দরিদ্রতা দূর হবে। একই সঙ্গে অন্যান্য বহু অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার নিরসন হবে।

রাসূলে করীম (সা.) নিশ্চিতভাবেই জানতেন, ইসলামী রাষ্ট্রে মৌলিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাকাতের প্রতিষ্ঠা হলে বহুবিধ কল্যাণ সাধিত হবে। তাই তিনি যাকাত যথাযথ আদায় ও তার সুষ্ঠু বন্টনের জন্যে কঠোর তাগিদ দিয়ে গেছেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সুষ্ঠুভাবে যাকাত আদায়ের জন্যে রাসূলে করীম (সা.) নবম ও দশম হিজরীতে আরব ভূখন্ডের বারোটি এলাকায় বারোজন প্রখ্যাত সাহাবীকে দায়িত্ব প্রদান করেন। নীচে এর বিবরণ দেয়া হলোঃ

এলাকা	সাহাবীগণের নাম
(১) মদীনা মুনাওয়ারা	বিলাল বিন রাবাহ
(২) মক্কা মুয়ায্যমা	হুরায়রাহ বিন শিবল

www.amarboi.org

(৩)	জেদ্দাহ	হারিস বিন নওফল
(৪)	তায়েফ	উসমান বিন আবী আল-আস
(৫)	সানা	মুহাজির বিন আবি উমাইয়াহ
(৬)	নাজরান	আলী বিন আবী তালিব
(৭)	ইয়ামান	মুআ'য বিন জাবাল
(৮)	বাহরাইন	আবান বিন সাঈদ
(৯)	হুনায়ন	আমর বিন আল-আস
(১০)	খায়বার	সাওয়াদ বিন আযীয়াহ
(১১)	ওয়াদী উল কুরা	আমর বিন সাঈদ
(১২)	হাযরামাউত	যিয়াদ বিন লাবীদ

অনুরূপভাবে পনেরোটি প্রধান গোত্র হতে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব তিনি বারোজন খ্যাতনামা সাহাবীর উপর অর্পণ করেছিলেন। যথা-

গোত্র		সাহাবীগণের নাম
(১)	বনু মুসতালিক	ওয়ালীদ বিন উকবাহ
(২)	বনু গাতফান	নওফাল বিন মুয়াবিয়াহ
(৩)	বনু হাওয়াযিন	ইকরামাহ বিন আবু জাহল
(৪)	বনু গিফার ও বনু আসলাম	বুরাইদাহ বিন হুসায়ব
(৫)	বনু হানযালাহ	মালিক বিন নোওয়াইরাহ
(৬)	বনু সুলাইম ও বনু মুযাইনাহ	আব্বাদ বিন বশীর আশহালী
(৭)	বনু তামীম	উয়ায়নাহ বিন হিসন
(৮)	বনু জুহায়নাহ	রাফি বিন মাকীস
(৯)	বনু কিলাব	যাহহাক বিন সুফিয়ান
(১০)	বনু সাকীফ	কিলাব বিন উমাইয়াহ
(১১)	বনু আযদ	হুযায়ফা বিন আল ইয়ামান
(১২)	বনু তাঈ ও বনু আসাদ	আদী বিন হাতীম

যাকাত যথাযথ বিলি বন্টনের জন্যেও নবীজীর (সা.) উদ্যোগেই বলিষ্ঠ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরী হয়েছিল যা আজকের যেকোন উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সঙ্গে তুলনীয়। এ থেকেই বোঝা যায় যাকাত বায়তুলমালের কত বড়

www.amarboi.org

গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এই প্রতিষ্ঠানে নীচে বর্ণিত আট শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োজিত ছিল। এরা হচ্ছে-

১. সায়ী = গবাদি পশুর যাকাত সংগ্রাহক;
২. ক্বাতিব = করণিক;
৩. ক্বাসাম = বন্টনকারী;
৪. আশির = যাকাত প্রদানকারী ও যাকাত প্রাপকদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনকারী;
৫. আরিফ = যাকাত প্রাপকদের অনুসন্ধানকারী;
৬. হাসিব = হিসাব রক্ষক;
৭. হাফিজ = যাকাতের বস্তু ও অর্থ সংরক্ষক; এবং
৮. ক্বায়াল = যাকাতের পরিমাণ নির্ণয় ও ওজনকারী।

যাকাতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বহুবিধ। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান এবং মুখ্য হচ্ছে কতিপয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে না দেওয়া। ইসলাম সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যকে শুধু নিন্দাই করে না, বরং তা দূরীভূত করার পদক্ষেপও অবলম্বন করতে বলে। তাই একটি সুখী, সুন্দর এবং উন্নত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে বিত্তশালী মুসলিমদের অবশ্যই তাঁদের সম্পদের একটা অংশ ব্যয় করা উচিৎ। এর ফলে শুধু অসহায় ও দুঃস্থ মানবতার কল্যাণ হবে তাই নয়, আয়-বন্টনের বৈষম্যও হ্রাস পাবে।

যাকাত প্রদানের ফলে সম্পদশালী মুসলিমের মন হতে ধন-সম্পদের লালসা দূরীভূত হবে। দরিদ্রদের অভাব মোচনের জন্যে নিজেদের দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে তারা সচেতন হবে। বিত্তবান মুসলমানদের আল্লাহ্ সৎপথে তাদের সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। বাৎসরিক উদ্বৃত্ত অর্থ হতে নির্দিষ্ট হারে একটা অংশ দরিদ্র এবং দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের মধ্যে তারা বিতরণ করবেন। এর ফলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবেন।

যাকাত মজুতদারী বন্ধ করারও এক প্রধান ও বলিষ্ঠ উপায়। মজুতকৃত সম্পদের উপরই যাকাত হিসেব করা হয়ে থাকে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ এবং মজুত সম্পদ যেকোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হয়ে তাকে। অবৈধভাবে অর্থ মজুত করার ফলে নানারকম সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা

www.amarboi.org

এর প্রকৃষ্ট নজীর। অল্প কিছু লোকের হাতে বিপুল অবৈধ ও কালো টাকা জমেছিল। সরকারের এমন কোন কৌশল বা পদ্ধতি ছিল না যার দ্বারা এই অবৈধ অর্থের সঠিক পরিমাণ জানা সম্ভব ছিল। ফলে এসবের ব্যয় ও ব্যবহারের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায়নি। পরিণামে সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির ও সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যের।

কোন পদ্ধতিই সার্থকভাবে উপরোক্ত সমস্যার মুকাবিলা করতে সক্ষম নয়। একমাত্র ইসলামেই তার সমাধান রয়েছে। কারণ বিত্তবানদের জন্যে তাদের মজুতকৃত অর্থ বা সম্পদের একটা অংশ নিছক বিলিয়ে দেবার মতো কোন পার্থিব কারণ নেই। কিন্তু একজন মুসলমানের আল্লাহ্ ও আখিরাতের ভয় রয়েছে। উপরন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রবর্তিত আইনে সরকারের হাতে প্রভূত ক্ষমতাও রয়েছে মজুত সম্পদকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ব্যয়, বিতরণ বা সরকারের কাছে সমর্পণে বাধ্য করতে। এর ফলে বিত্তবানদের সামনে দু'টি মাত্র পথ খোলা থাকবে-

১. শিল্প বা ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করা, অথবা
২. ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী তা ব্যয় করা।

যাকাতের অন্যতম অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী সমাজ হতে দারিদ্র্য দূর করা। দারিদ্র্য মানবতার পয়লা নম্বরের দুশমন। ক্ষেত্রবিশেষে তা কুফরী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। যে কোন সমাজ ও দেশের এটা সবচেয়ে জটিল ও তীব্র সমস্যা। সমাজে হতাশা ও বঞ্চনার অনুভূতির সৃষ্টি হয় দরিদ্রতার ফলে। পরিণামে দেখা দেয় সামাজিক সংঘাত। বহু সময়ে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান পর্যন্ত ঘটে। অধিকাংশ অপরাধই সচরাচর ঘটে দরিদ্রতার জন্যে। এ সমস্যাগুলির প্রতিবিধান করার জন্যে যাকাত ইসলামের অন্যতম মূখ্য হাতিয়ার। যে আট শ্রেণীর লোকের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যাকাত লাভের ফলে তাদের দিনগুলি আনন্দ ও নিরাপত্তার হতে পারে। যাকাত যথাযথভাবে আদায় ও পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা হলে আজকের দিনেও এর মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের লোকদের মধ্যে যখন যাকাতের অর্থসামগ্রী বন্টন করে দেওয়া হয় তখন শুধু যে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় তাই নয়, বরং অর্থনৈতিক কার্যক্রমেও গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। দরিদ্র ও দুর্গত লোকদের ক্রয়ক্ষমতা থাকে না। বেকারত্ব তাদের নিত্যসঙ্গী।

www.amarboi.org

যাকাত প্রাপ্তির ফলে তাদের হাতে অর্থাগম হলে বাজারে কার্যকর চাহিদার সৃষ্টি হয়। এরই ফলে দীর্ঘ মেয়াদে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নির্মাণ ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয় অনুকূল পরিবেশ। ফলশ্রুতিতে প্রচলিত সামাজিক শ্রেণীসমূহের মধ্যে আয়গত পার্থক্যও হ্রাস পেতে থাকে।

৫. বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা

রাসূলে করীম (সা.) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বায়তুল মালেরও প্রতিষ্ঠা করেন। বায়তুল মাল বলতে সরকারের অর্থসম্বন্ধীয় কর্মকান্ড বুঝায় না। বরং বিভিন্ন উৎস হতে অর্জিত ও রাষ্ট্রের কোষাগারে জমাকৃত ধন-সম্পদকেই বায়তুল মাল বলা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই এতে সম্মিলিত মালিকানা রয়েছে। প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা রাজকীয় ধনাগারের সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালে সঞ্চিত ধন-সম্পদের উপর জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ভাষা নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের সাধারণ অধিকার স্বীকৃত। রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে একজন লোকও যেন মৌলিক মানবিক প্রয়োজন হতে বঞ্চিত না হয় তার ব্যবস্থা করা বায়তুল মালের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব।

প্রত্যেক নাগরিকই তার প্রয়োজনীয় পরিমাণ ন্যূনতম অর্থ বা সম্পদ বায়তুল মাল হতে গ্রহণ করতে পারে। সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করেও যদি জীবিকার অভাব পূরণ না হয় বা সমাজের স্বচ্ছল লোকজন তাদের দরিদ্র আত্মীয় ও পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করার পরও মৌলিক প্রয়োজন অপূর্ণ থেকে যায় তবেই মাত্র বায়তুল মাল হতে সাহায্য গ্রহণ করা যাবে। ইসলামে এভাবেই সমস্ত নাগরিকের জন্যে আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ব্যবস্থা শুধু প্রথমই নয়, মৌলিকও।

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বায়তুলমালে অর্থ সংস্থানের উৎসগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. অর্থ সম্পদ ও গবাদি পশুর যাকাত;
২. সদাকাতুল ফিতর;
৩. কাফফারাহ;
৪. ওশর/ ওশরের অর্ধেক;
৫. খারাজ;
৬. গণীমতের মাল ও ফাই;
৭. জিজিয়া;

www.amarboi.org

৮. খনিজ সম্পদের আয়;
৯. নদী ও সমুদ্র হতে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ;
১০. ইজারা ও কেরায়ার অর্থ;
১১. মালিক ও উত্তরাধিকারহীন সম্পদ;
১২. আমদানী ও রফতানী শুল্ক;
১৩. রাষ্ট্রের মালিকানা ও কর্তৃত্বাধীন জমি, বন ব্যবসায় ও শিল্পের মুনাফা;
১৪. শরীয়াহ্ মোতাবেক আরোপিত কর; এবং
১৫. বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের অনুদান ও উপঢৌকন।

বায়তুল মালের আয় বৃদ্ধির জন্যে উল্লেখিত উৎসসমূহকে অবশ্যই পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। এসমস্ত উৎস হতে যথাযথভাবে অর্থাগম নিশ্চিত করা এবং সুষ্ঠু বন্টনের উদ্দেশ্যে রাসুলে করীমের (সা.) পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহান খুলাফায়ে রাশিদীনের (রা.) আমলেও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ যাকাতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

যে সমস্ত খাতে বায়তুলমালের অর্থ ব্যয়ের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে সেগুলি হচ্ছে ঃ

১. রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার কর্মচারীদের বেতন;
২. বন্দী ও কয়েদীদের ভরণ-পোষণ;
৩. লা-ওয়ারিশ শিশুদের প্রতিপালন;
৪. অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা;
৫. করযে হাসানা প্রদান; এবং
৬. সামাজিক কল্যাণ।

রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারী কর্মচারীদের বেতন ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর বেতন বায়তুল মাল হতেই নেবেন। তবে এর পরিমাণ হবে তাঁর প্রয়োজন ও সাম্প্রতিক দ্রব্যমূল্য অনুসারে সাধারণ প্রচলিত হারের সমান। এ ক্ষেত্রে হযরত উমর ফারুক (রা.) এর বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন-

"তোমাদের সামগ্রিক ধনসম্পদ ইয়াতীমের ধনসম্পদের সমতুল্য এবং আমি যেন ইয়াতীমের মালেরই রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব আমি যদি ধনী হই-তবে আমি বায়তুলমাল হতে কিছুই গ্রহণ করব না। আর যদি দরিদ্র ও অভাবী হই, তবে অপরিহার্য পরিমাণ কিংবা সাধারণ প্রচলিত মানের বেতনই আমি গ্রহণ করব।"

(আবু ইউসূফ -*কিতাবুল খারাজ*)

www.amarboi.org

অথচ আজ বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহেরেই রাষ্ট্রপ্রধানদের বার্ষিক বেতন ও বিভিন্ন এ্যালাউন্সের পরিমাণ সেসব দেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের এক বিরাট অংশ। রাষ্ট্রপ্রধানগণ বেতন ছাড়াও নানা ধরনের এ্যালাউন্স ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এত বেশী পেয়ে থাকেন যে তার হিসেব করলে দেশের সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে পার্থক্যের পরিমাণ দাঁড়াবে ১০,০০০ : ১।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারীদের জন্যে "ভরণ-পোষণের দায়িত্বপালনক্ষম বেতন নীতির" কথা বলা হয়েছে। নিম্নপদস্থ বা সাধারণ কর্মচারীদের ন্যূনতম প্রয়োজন অপূর্ণ রেখে উচ্চপদস্থ অফিসারদের বিলাস ব্যসনের ব্যবস্থার অনুমতি ইসলাম দেয়নি। বেতন নির্ধারণ সম্পর্কে হযরত উমর ফারুক (রা.) এর গৃহীত নীতি এ প্রসঙ্গে সবিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে। সে নীতিতে মূখ্য বিচার্য বিষয় ছিল একজন ব্যক্তি–

১. ইসলামের জন্যে কি পরিমাণ দুঃখ ভোগ করেছে;
২. ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে কতখানি অগ্রসর হয়েছে;
৩. ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কতখানি কষ্ট স্বীকার করেছে;
৪. ইসলামী জীবন যাপনের জন্যে প্রকৃত প্রয়োজন কতখানি; এবং
৫. কতজন লোকের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত রয়েছে।

বন্দী ও কয়েদীদের ভরণ-পোষণ ঃ অত্যাধুনিক এই সভ্য যুগেও বন্দী ও কয়েদীদের সঙ্গে যে অমানুষিক আচরণ করা হয়ে থাকে তা কারো অবিদিত নয়। এদের ন্যূনতম প্রয়োজনও মেটানো হয় না। বরং নির্মম ও নির্দয় ব্যবহারের শিকার হয়ে থাকে তারা। ক্ষুৎপিপাসায়, বিনা চিকিৎসায় তিলে তিলে ধুঁকে ধুঁকে মারা যায় বন্দীরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বা বন্দী শিবিরগুলিতে। সোভিয়েত রাশিয়ার লেবার ক্যাম্প ও আফগানিস্তানের যুদ্ধবন্দীদের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আচরণ এর প্রকৃষ্ট নজীর।

যুদ্ধবন্দী ও বিভিন্ন অপরাধে কয়েদীদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ইসলামী সরকার বাধ্য। রাসুলে করীম (সা.) বন্দী ও কয়েদীদের সঙ্গে যে অপূর্ব সুন্দর ব্যবহার করেছেন দুনিয়ার ইতিহাসে তার নজীর বিরল। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে যখন এই নীতি অনুসৃত হতো তখন পাশাপাশি রোমান ও বাইজেন্টাইন শাসকবর্গ তাদের যুদ্ধবন্দী ও কয়েদীদের সঙ্গে যে ব্যবহার করতো তা ছিল নিষ্ঠুর ও হৃদয়বিদারক।

লা-ওয়ারিশ শিশুদের প্রতিপালন ঃ ইয়াতীম, অনাথ ও লা-ওয়ারিশ শিশুদের লালন পালন করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। মনে রাখা দরকার, যে সমাজে ইয়াতীমের

www.amarboi.org

ধন-সম্পদ আত্মসাৎ ছিল সাধারণ ঘটনা সেই সমাজেই রাসুলের (সা.) বিপ্লবী চেতনার ফলে লা-ওয়ারিশ শিশুরা রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়েছিল। তাদের লালন-পালন ও জীবিকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতেই ন্যস্ত হয়। রাসুল (সা.) বলেন-

"যে ব্যক্তি কোন দায়ভার রেখে যাবে তা বহন করা আমার কর্তব্য।"

(আবু দাউদ)

বায়তুল মাল হতেই এই দায়ভার বহনের বিধান করা হয়েছিল। অমুসলিমদের লা-ওয়ারিশ সন্তানদের সম্পর্কেও এই একই নীতি অনুসৃত হতো।

অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান ঃ ইসলামের সামাজিক নিরাপত্তা শুধুমাত্র মুসলিম নাগরিকদের জন্যেই নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ভাষা-লিঙ্গ নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। বিধর্মীরা অক্ষম অবস্থায় জিজিয়া দেবে না, বরং রাষ্ট্র তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে বায়তুল মাল হতে।

করযে হাসানা প্রদান ঃ আইয়ামে জাহেলিয়া বা তার পূর্ববর্তী যুগে বিনা প্রতিদানে ঋণ দেবার রীতি চালু ছিল না। বরং সুদই ছিল লেনদেনের ভিত্তি। রাসুলে করীম (সা.) এই রীতির মূলোচ্ছেদ করেন এবং বিনা সুদে ঋণ বা করযে হাসানা দেবার রীতি চালু করেন। সুদমুক্ত অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্যে এ ছিল বলিষ্ঠ ও প্রত্যয়দৃঢ় পদক্ষেপ। বিশ্বে প্রচলিত আর কোনও ধরনের অর্থনীতিতে এই ব্যবস্থা ছিল না, আজও নেই।

সামাজিক কল্যাণ ঃ সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন হতে পারে এমন সব কাজে বায়তুল মাল হতেই অর্থ ব্যয় করার বিধান রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই অর্থেই জনগণের কল্যাণ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কাজ করা হতো। সরাইখানা নির্মাণ, শিক্ষাবিস্তার, পানির নহর খনন প্রভৃতি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ যুগেও শিক্ষার সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার বিস্তার, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ পদ্ধতির ব্যাপক সম্প্রসারণ, পথিকদের সুবিধার ব্যবস্থা সবই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বিনামূল্যে নির্দিষ্ট একটা স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদান, রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট ও সেতু নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন সবই সমাজকল্যাণের আওতাভুক্ত। মুসাফিরখানা স্থাপন, ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ, গরমৌসুমে কাজের বিনিময়ে খাদ্যের যোগান, পুষ্টিহীনতা দূর, শ্রমিক কল্যাণ প্রভৃতিও সরকারের দায়িত্ব। এসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে বায়তুল মালের অর্থ ও সম্পদ হবে সবচেয়ে বড় সহায়ক।

www.amarboi.org

কোন নাগরিক যখন দরিদ্র হয়ে পড়বে, বৃদ্ধ হয়ে উপার্জন ক্ষমতা হারাবে তখন তার যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রের উপর নাগরিকদের এই অধিকার ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক। রাসুলের (সা.) পর খুলাফায়ে রাশেদীনও (রা.) এই দাবী পূরণে যত্নবান ছিলেন।

বস্তুতঃ বায়তুল মালের অর্থ সম্পদ জনগণের প্রয়োজন, সামাজিক কল্যাণ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও উন্নয়ন এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের জন্যে ব্যবহৃত হবে। এরই ফলশ্রুতিতে একটি অভাবমুক্ত সুখী সমাজ ও আধুনিক কল্যাণমুখী ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে। এর বিপরীতে যখন বায়তুলমাল রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিমালিকানাধীন ধনভান্ডার রূপে ব্যবহৃত হয় অথবা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের খেয়ালখুশী মতো অর্থ সম্পদ ব্যয়িত হয় তখন তা রাসুলের (সা.) নির্দেশের সুস্পষ্ট বরখেলাপ হিসেবেই গণ্য হবে।

৬. মানবিক শ্রমনীতির প্রবর্তন

বিশ্বের ইতিহাসে মানবতার বন্ধু রাহমাতুল্লিল আলামীনই (সা.) সর্বপ্রথম মানবিক শ্রমনীতির প্রবর্তন করেন। তাঁর পূর্বে কোন দেশ বা অর্থনীতিতেই শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়াস গৃহীত হয়নি। এমনকি পরেও কোন দেশ বা মতবাদে সমতুল্য কোন নীতি গৃহীত হয়নি। আজ হতে চৌদ্দশত বছর পূর্বে রাসুল (সা.) প্রবর্তিত শ্রমনীতি আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শ্রমনীতি। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অনুসৃত শ্রমনীতি মানবিক নয়, ইনসাফভিত্তিক তো নয়ই। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, শ্রমিকদের সঙ্গে ব্যবহার, তাদের বেতন ও মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে রাসুলে করীমের (সা.) প্রদর্শিত পথ ও হাদীসসমূহ থেকেই ইসলামের বৈপ্লবিক ও মানবিক শ্রমনীতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে। মজুরদের অধিকার সম্বন্ধে তিনি বলেন-

"তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদের দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন। কাজেই আল্লাহ যাদের উপর এরূপ দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন তাদের কর্তব্য হলো তারা যে রকম খাবার খাবে তাদেরকেও সেরকম খাবার দেবে, তারা যা পরিধান করবে তাদেরকেও তা পরাবার ব্যবস্থা করবে। যে কাজ করা তাদের পক্ষে কষ্টকর ও সাধ্যাতীত তা করার জন্যে তাদেরকে কখনও বাধ্য করবে না। যদি সে কাজ তাদের দিয়েই করাতে হয় তা হলে সেজন্যে তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য অবশ্যই করতে হবে।" (বুখারী)

www.amarboi.org

অন্যত্র রাসুলে করীম (সা.) শ্রমিকদের সম্পর্কে বলেছেন- "শ্রমিককে এমন কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না, যা তাদেরকে অক্ষম ও অকর্মণ্য বানিয়ে দেবে।"

(তিরমিযী)

"তাদের উপর অতখানি চাপ দেওয়া যেতে পারে, যতখানি তাদের সামর্থ্যে কুলায়। সাধ্যাতীত কোন কাজের নির্দেশ কিছুতেই দেওয়া যেতে পারে না।"

(মুয়াত্তা, মুসলিম)

মজুরদের বেতন, উৎপাদিত পণ্যে তাদের অংশ ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন–

"মজুরের মজুরী তার গায়ের ঘাম শুকোবার পূর্বেই পরিশোধ কর।"

(ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

"মজুরকে তার কাজ হতে অংশ দান কর। কারণ, আল্লাহর মজুরকে কিছুতেই বঞ্চিত করা যেতে পারে না।"

(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল)

উপরোক্ত হাদীসসমূহ হতে যেসব মূলনীতি পাওয়া যায় সেগুলোই রাসুলে করীম (সা.) প্রবর্তিত মানবিক শ্রমনীতি। সংক্ষেপে এগুলো হচ্ছে-

১. উদ্যোক্তা বা শিল্প মালিক মজুর-শ্রমিককে নিজের ভাইয়ের মতো মনে করবে। সহোদর ভাইয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে এ ক্ষেত্রেও সেরকম সম্পর্ক থাকবে।

২. অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিক উভয়েরই মান সমান হবে। মালিক যা খাবে ও পরবে শ্রমিককেও তাই খেতে ও পরতে দেবে।

৩. সময় ও কাজ উভয় দিক দিয়েই শ্রমিকদের সাধ্যমতো দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে, তার বেশী নয়। শ্রমিককে এত বেশী কাজ দেওয়া উচিৎ হবে না যাতে সে ক্লান্ত ও পীড়িত হয়ে পড়ে। এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাকে শ্রম দিতে বাধ্য করা যাবে না, যার ফলে সে অক্ষম হয়ে পড়ে। শ্রমিকের কাজের সময় নির্দিষ্ট হতে হবে এবং বিশ্রামের সুযোগ থাকতে হবে।

www.amarboi.org

৪. যে শ্রমিকের পক্ষে একটি কাজ করা অসাধ্য তা সম্পন্ন হবে না এমন কথা ইসলাম বলে না। বরং সেক্ষেত্রে আরও বেশী সময় দিয়ে বা বেশী শ্রমিক নিয়োগ করে তা সম্পন্ন করা যেতে পারে।

৫. শ্রমিকদের বেতন শুধুমাত্র তাদের জীবন রক্ষার জন্যে যথেষ্ট হলে হবে না। তাদের স্বাস্থ্য, শক্তি ও সজীবতা রক্ষার জন্যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ভিত্তিতেই বেতন নির্ধারণ করতে হবে।

৬. উৎপন্ন দ্রব্যের অংশবিশেষ বা লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশও শ্রমিকদের দান করতে হবে।

৭. শ্রমিকদের কাজে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে তাদের প্রতি অমানুষিক আচরণ বা নির্যাতন করা চলবে না। বরং যথাসম্ভব সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে।

৮. চুক্তিমত কাজ শেষ হলে অথবা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে শ্রমিককে দ্রুত মজুরী বা বেতন পরিশোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন ওজর-আপত্তি বা গাফলতি করা চলবে না।

৯. পেশা বা কাজ নির্বাচন করার ও মজুরীর পরিমাণ বা হার নির্ধারণ সম্পর্কেও দর-দস্তুর করার পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার শ্রমিকের রয়েছে। মজুরী ও কাজের সময় পূর্বেই স্থির করে নিতে হবে। উপরন্তু শ্রমিকদের বিশেষ কোন কাজে বা মজুরীর বিশেষ কোন পরিমাণের বিনিময়ে কাজ করতে জবরদস্তি করা যাবে না।

১০. কোন অবস্থাতেই মজুরদের অসহায় করে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। তারা অক্ষম ও বৃদ্ধ হয়ে পড়লে পেনশন বা ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বায়তুল মালের তহবিল ব্যবহৃত হতে পারে।

উপরে বর্ণিত নীতিমালার আলোকে দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, ইসলামে মজুরের যে মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কোন সুযোগ থাকে না। দুইয়ের সম্মিলিত চেষ্টা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতার ফলে শিল্পের ক্রমাগত উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। সর্বোপরি মুমিন মুসলমান শিল্প-মালিক ও উদ্যোক্তরা ঈমানের তাগিদে পরকালের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যেই এই শ্রমনীতি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে, অন্য কোন ধরনের অর্থনীতিতে যা প্রত্যাশা করা একেবারেই অসম্ভব। 'দুনিয়ার মজদুর

www.amarboi.org

এক হও' –শ্লোগানসর্বস্ব সমাজতন্ত্রের বাধ্যতামূলক শ্রমদান যেমন এখানে অনুপস্থিত, তেমনি পুঁজিবাদী মালিকের অবমাননাকর শর্ত ও লাগামহীন শোষণও এখানে নেই। শ্রমিক ও মালিক পরস্পর ভাই- এই বিপ্লবাত্মক ঘোষণাই ইসলামী শ্রমনীতির মূল উপজীব্য।

৭. ওশরের প্রবর্তন ও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ইসলামীকরণ

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত আরব ভূখণ্ডে ভূমি রাজস্বের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। রাসূলে করীম (সা.) এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেন। সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের জন্যে তিনি একটি নির্দিষ্ট হারে ওশর নির্ধারণ করেছিলেন। কৃষি কাজের উপযুক্ততার দিক থেকে জমির দু'টি শ্রেণী রয়েছে- সেচবিহীন ও সেচযুক্ত। প্রথমোক্ত ভূমি আল্লাহর অফুরন্ত রহমত বৃষ্টির পানিতেই সিক্ত হয়। অন্যটিতে মানুষ কায়িক শ্রম, পশুশ্রম বা যন্ত্রের সাহায্যে জলসেচ করে কৃষি কাজের উপযুক্ত করে নেয়। এই উভয় ধরনের জমির ওশরের ব্যাপারে রাসূলে করীম (সা.) যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তা নিম্নরূপ-

"মুসলমানদের নিকট থেকে ওশর (এক-দশমাংশ) আদায় করবে। এই পরিমাণ ফসল ঐসব জমি হতে গ্রহণ করা হবে যা বৃষ্টি বা ঝর্ণার (স্বাভাবিক) পানিতে সিক্ত হয়। কিন্তু যেসব জমিতে স্বতন্ত্রভাবে পানি সেচ করতে হয় সেসব হতে এক-বিংশতি অংশ (*নিসফে ওশর*) আদায় করতে হবে।"

(*তারীখ-ই-তাবারী, ফতুহুল বুলদান*)

এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হচ্ছে যে, প্রতিটি মুসলিম তার জমিতে বছরে যা কিছু উৎপন্ন হোক না কেন তা থেকে ওশর অর্থাৎ এক-দশমাংশ এবং ক্ষেত্র বিশেষে ওশরের অর্ধেক অর্থাৎ এক-বিংশতি অংশ বায়তুল মালে জমা করে দেবে। অবশ্য নিসাব পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হলে তবেই ওশর আদায় করতে হবে। ওশরের কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নীচে সেগুলি উল্লেখ করা গেল।

প্রথমতঃ ওশর কখনই এবং কোন অবস্থাতেই রহিত করা যাবে না। এর হারও চিরকালের জন্যে নির্দিষ্ট। এ থেকে কোন অবস্থাতেই কাউকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে না। তবে কোন মৌসুমে কোন ফসল নিসাব পরিমাণের কম উৎপন্ন হলে তার ওশর আদায় করতে হবে না।

দ্বিতীয়তঃ ওশর আদায় করতে হবে প্রতিটি ফসল হতেই। অর্থাৎ, যেসব জমিতে বছরে দুটি বা তিনটি ফসল হবে সেই ফসলের প্রত্যেকটি হতেই ওশর আদায়

www.amarboi.org

করতে হবে। এর ফলে বায়তুল মালের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, পরোক্ষভাবে জাতি ও দেশেরই কল্যাণ করা হবে।

তৃতীয়তঃ ওশর আদায় করতে হবে ফসলের দ্বারাই। এ ব্যবস্থা কৃষক বা ভূমি মালিকের জন্যে খুবই অনুকূল। কারণ, ফসল কমই হোক আর বেশীই হোক, তা থেকে নির্দিষ্ট অংশ পরিশোধ করতে কৃষকের অসুবিধার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া নগদ টাকায় যদি ওশর দিতে হয় তাহলে কৃষকের অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফসলের দাম কখনই নির্দিষ্ট থাকে না। কোন বছর যদি বিশেষ কোন ফসল বেশী পরিমাণ উৎপন্ন হয় বা অন্য কোন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে মূল্য হ্রাস পায় তাহলে নির্দিষ্ট ওশর পরিশোধ করার জন্যে কৃষক অধিক পরিমাণে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হবে। এতে কৃষকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মতবাদ অনুযায়ী নানা ধরনের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ইউরোপে, বিশেষতঃ ইংল্যান্ডে এই সেদিনও ভূমিদাসদের দ্বারা জমি চাষ করানো হতো। সাধারণ রায়তদের উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের বেশী জমিদার ও চার্চের নামে আদায় করা হতো। ভূমির মালিকানা মুষ্টিমেয় পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর শিল্প বিপ্লবের ফলে জমির উৎপাদন যখন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, তখন বড় বড় শিল্পপতিরা হাজার হাজার একর জমি সস্তায় কিনে নেয় অথবা শক্তির দ্বারা চাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে। ফলে বেকার ও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজতন্ত্রে ভূমিস্বত্ব নীতিতে জমির ব্যক্তি মালিকানা শুধু অস্বীকারই করা হয়নি, বরং ব্যক্তিকে জমি হতে উচ্ছেদ করা হয়েছে। সমস্ত জমি রাষ্ট্রের একচ্ছত্র মালিকানায় আনা হয়েছে। এজন্যে লক্ষ লক্ষ লোককে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। লেবার ক্যাম্প বা বন্দী শিবিরে পাঠানো হয়েছে আরও বহু লক্ষকে। নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে হাজার হাজার ভূস্বামীকে। তবেই জমি রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণ করা সম্ভব হয়েছিল। উপরন্তু কৃষকদের এই রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারে কাজ করতে গায়ের জোরে বাধ্য করা হয়েছে। বিনিময়ে অনেক সময় তাদের ভরণ-পোষণের উপযুক্ত ন্যূনতম পারিশ্রমিকও জোটেনি।

এই উভয় প্রকার ভূমিব্যবস্থাই বঞ্চনামূলক ও স্বভাববিরোধী। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজ ও জাতি বঞ্চিত; সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি মানুষ শুধু বঞ্চিতই নয়, বরং শোষিত ও নিপীড়িত। এই অবস্থা যেন আদৌ সৃষ্টি না হয় সেজন্যে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই রাসুলে করীম (সা.) তাঁর অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিস্বত্ব নীতি ঘোষণা করেছিলেন।

www.amarboi.org

আব্বাসীয় খিলাফত পর্যন্ত সে নীতি অনুসারে ভূমির বিলি-বন্টন ও মালিকানা নির্ধারিত হয়েছে।

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ (সা.) চূড়ান্ত ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, জমি জায়গা সব কিছুই আল্লাহর। মানুষ তাঁরই দাস। অতএব যে ব্যক্তি অনাবাদী জমি চাষ উপযোগী ও উৎপাদনক্ষম করে তুলবে তার মালিকানা লাভে সেই-ই অগ্রাধিকার পাবে।" (আবু দাউদ)

ইসলামী ভূমিস্বত্ব নীতি অনুযায়ী জমির মালিকানা লাভ ও ভোগদখলের দৃষ্টিতে জমিকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হচ্ছে-

১. আবাদী ও মালিকানাধীন জমি। মালিকের বৈধ অনুমতি ব্যতীত এই জমি অপর কেউ ব্যবহার বা কোন অংশ দখল করতে পারবে না।

২. কারো মালিকানাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পতিত আবাদ অযোগ্য জমি। এই জমিতে বসবাস নেই, কৃষিকাজ হয় না, ফলমূলেরও চাষ হয় না। এই শ্রেণীর জমিও মালিকেরই অধিকারভুক্ত থাকবে।

৩. জনগণের সাধারণ কল্যাণের জন্যে নির্দিষ্ট জমি। কবরস্থান, মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, স্কুল-কলেজ, চারণভূমি ইত্যাদি সর্বসাধারণের জন্যে নির্দিষ্ট জমি এই শ্রেণীর আওতাভুক্ত।

৪. অনাবাদী ও পরিত্যক্ত জমি যার কোন মালিক নেই বা কেউ ভোগ-দখলও করছে না। এ ধরনের জমির বিলি-বন্টন সম্পর্কে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

"অনাবাদী, অনুর্বর, মালিকহীন ও উত্তরাধিকারহীন জমি-জায়গা এবং যে জমিতে কেউ চাষাবাদ ও ফসল ফলানোর কাজ করে না তা ইসলামী রাষ্ট্রের উপযুক্ত লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ ব্যাপারে সকল মুসলমানের সাধারণ ও নির্বিশেষ অধিকার স্বীকার ও সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধনই নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে"।

(আবু ইউসুফ-*কিতাবুল খারাজ*)

ইসলামে মাত্র এক প্রকার ভূমিস্বত্বই স্বীকৃত – রাষ্ট্রের সঙ্গে ভূমি মালিকের সরাসরি সম্পর্ক। জমিদার তালুকদার মনসবদার প্রমুখ মধ্যস্বত্বভোগীর কোন স্থান ইসলামে নেই। সে কারণে শোষণও নেই। উপরন্তু ওশর (ক্ষেত্র বিশেষে ওশরের অর্ধেক) ও খারাজ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় জমির মালিক বা কৃষকদের উপর ইনসাফ ও ইহসান করা হয়েছে।

www.amarboi.org

জমি পতিত রাখাকে ইসলাম সমর্থন করেনি, সে জমি রাষ্ট্রেরই হোক আর ব্যক্তিরই হোক। জমির মালিক যদি বৃদ্ধ পঙ্গু অশক্ত শিশু বা স্ত্রীলোক হয় অথবা চাষাবাদ করতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হয় তবে অন্যের দ্বারা জমি চাষ করাতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসুলে করীমের (সা.) নির্দেশ হচ্ছে-

"যার অতিরিক্ত জমি রয়েছে সে তা হয় নিজে চাষ করবে, অন্যথায় তার কোন ভাইয়ের দ্বারা চাষ করাবে অথবা তাকে চাষ করতে দেবে।"

(ইবনে মাজাহ)

অন্য এক হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন-
"সেই জমি নিজেরা চাষ কর কিংবা অন্যদের দ্বারা চাষ করাও।"

(মুসলিম)

উপরে বর্ণিত হাদীস দুটির আলোকেই হযরত উমর ফারুক (রা.) হযরত বিলাল ইবনুল হারেস (রা.) এর নিকট হতে রাসুলে করীম (সা.) প্রদত্ত জমির যে পরিমাণ তাঁর চাষের সাধ্যাতীত ছিল তা ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং মুসলিম কৃষকদের মধ্যে পুনর্বন্টন করে দিয়েছিলেন।

বর্তমান সময়ে প্রতি ইঞ্চি জমি চাষের আওতায় আনবার জন্যে এক দিকে কিছু দেশ আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। অন্যদিকে ফসলের দাম কমে যাওয়ার ভয়ে কোন কোন দেশে হাজার হাজার একর জমি ইচ্ছাকৃতভাবে অনাবাদী ও পতিত রাখা হচ্ছে। তাই সামগ্রিকভাবে পৃথিবীতে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে বিশ্বে খাদ্যের অনটন লেগেই রয়েছে। সুতরাং, জমি যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে অনাবাদী ও পতিত রাখা যাবে না তেমনি সমস্ত পতিত জমি চাষের আওতায় আনতে হবে। ইসলামের দাবীই তাই। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পতিত জমি শুধু ব্যক্তিকে চাষ করতেই বলা হয়নি, উৎসাহ দেবার জন্যে ঐ জমিতে তার মালিকানাও স্বীকার করা হয়েছে। রাসুলে করীম (সা.) বলেছেন-

"যে লোক পোড়ো ও অনাবাদী জমি আবাদ ও চাষযোগ্য করে নেবে সে তার মালিক হবে।" (আবু দাউদ)

ইচ্ছাকৃতভাবে জমি অনাবাদী রাখার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। বরং জমি চাষের জন্যে এতদূর হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন আবাদী জমি পর পর তিন বছর চাষ না করলে তা রাষ্ট্রের দখলে চলে যাবে। রাষ্ট্রই তা পুনরায় কৃষকদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দেবে।

www.amarboi.org

উন্নত কৃষি ব্যবস্থার মুখ্য শর্ত হিসেবেই উন্নত ভূমিস্বত্ব ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়া দরকার। এ জন্যে ইসলামের সেই প্রারম্ভিক যুগে বিশ্ব মানবতার কল্যাণকামী ও শান্তির পথিকৃৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে ভূমিস্বত্ব ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন তা আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিধান। মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কোন দিক দিয়েই এর সমকক্ষ ও সমতুল্য কোন বিধানই আজকের পৃথিবীতে নেই।

৮. উত্তরাধিকার ব্যবস্থার যৌক্তিক রূপদান

শুধু আরব ভূখণ্ডেই নয়, রাসুলে করীমের (সা.) আবির্ভাবের পূর্বে সারা বিশ্বে ভূমির উত্তরাধিকার আইন ছিল অস্বাভাবিক। তখন পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্তানই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব লাভ করতো। বঞ্চিত হতো পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। এছাড়া সমাজে যৌথ পরিবার প্রথা চালু ছিল। এ প্রথার মূল বক্তব্য হচ্ছে সম্পত্তি গোটা পরিবারের হাতেই থাকবে। পরিবারের বাইরে তা যাবে না। ফলে মেয়েরা বিয়ের পর পিতার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হতো। উপরন্তু সম্পত্তির কর্তৃত্ব বা ব্যবস্থাপনার ভার জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্তানের হাতেই ন্যস্ত থাকত। এই দু'টি নীতিই হিন্দু, খ্রীষ্টান ও ইহুদী ধর্মে অনুসৃত হয়ে আসছিল যুগ যুগ ধরে। সম্পত্তি যেন বিভক্ত না হয় তার প্রতি সব ধর্মের ছিল তীক্ষ্ণ নজর। কারণ সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেলে পুঁজির পাহাড় গড়ে উঠবে না, গড়ে উঠবে না বিশেষ একটি ধনিক শ্রেণী যারা অর্থবলেই সমাজের প্রভুত্ব লাভ করে। এরাই নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে অত্যাচার, অবিচার, অনাচার ও নানা ধরনের সমাজবিধ্বংসী কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে।

উত্তরাধিকারিত্বের ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান ও প্রতিষ্ঠা ছিল রাসুলের (সা.) অনন্য অবদান। ইসলাম-পূর্ব যুগে সাধারণভাবে সম্পত্তিতে নারীদের কোন অধিকার ছিল না। ক্ষেত্রবিশেষে অনুকম্পাবশতঃ কাউকে কিছু দিলেও তা ছিল নিতান্তই দয়ার দান, অধিকার নয়। কিন্তু কখনোই কন্যারা পিতার বা স্ত্রীরা স্বামীর সম্পত্তির মালিকানা বা উত্তরাধিকারত্ব লাভ করতো না। বরং নারীরা নিজেরাই ছিল পণ্যসামগ্রীর মতো। এই অবস্থার অবসান ও প্রতিবিধানের জন্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন আল-কুরআনে সুরা আন-নিসার দুটি দীর্ঘ আয়াতে সম্পত্তির ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারিণী হিসেবে নারীদের অংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেই প্রথম পৃথিবীতে মাতা, ভগ্নি স্ত্রী ও কন্যা হিসেবে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ও অংশ স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হলো। এ বিধান ছিল সম্পত্তির

www.amarboi.org

এককেন্দ্রীকরণ বা পুঞ্জিভূতকরণ নিরোধের এক মোক্ষম ব্যবস্থা। অধিকন্তু মানুষের খেয়াল-খুশীর উপর সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়নি।

ইসলামে নারীকে দুই দিক দিয়ে সম্পত্তিতে অংশীদারত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রথমতঃ পিতার দিক হতে, দ্বিতীয়তঃ স্বামীর দিক হতে। পিতার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার বর্তাবে। একইভাবে স্বামীর মৃত্যুর পর তার সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। উপরন্তু স্ত্রী তার দেন-মোহরও পাবে। এভাবেই পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে যুগপৎ উত্তরাধিকারত্ব প্রদান করা হয়েছে নারীকে। যদি কোন কারণে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হয় তাহলে ইদ্দৎ পালনের সময়ে ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করতে হবে স্বামীকেই। তাছাড়া স্বামী মারা গেলে তখনও তারই বাড়ীতে ন্যূনতম এক বছর স্ত্রীর বসবাসের হক রয়েছে, যদি তার মধ্যে স্ত্রী পুনরায় বিবাহ না করে। ঐ সময়ের খরচও স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতেই বহন করা হবে।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, ইসলামের এই কালজয়ী, যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ যখন গৃহীত হয়েছিল নারী তখন বিবেচিত হতো সাধারণ পণ্যের মতো। কন্যা সন্তানের জন্ম ছিল অপরাধের শামিল। তাদেরকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হত। ইসলামে পূর্ববর্তী কোন সমাজেই নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকারের স্বীকৃতি ছিল না।

পুঁজিবাদী সমাজে উইল করে কোন বিত্তশালী মানুষ যেকোন কাজে তার সমুদয় সম্পত্তি দান করে যেতে পারে। বিশেষ করে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের শেষ নির্দেশ বা অসিয়তের সামাজিক ও আইনগত মূল্য খুব বেশী। এর সুযোগ নিয়ে মানুষ মৃত্যুর পূর্বে তার সর্বস্ব দান করে যায় ইচ্ছামতো যে কাউকে, ক্ষেত্রবিশেষে কুকুর, বিড়াল বা পাখীর জন্যে। এর পরিমাণ লক্ষ লক্ষ ডলার হয়ে থাকে। এমনও নজীর রয়েছে যে একদিকে পুত্র-কন্যা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে পথে পথে ঘোরে, অপরদিকে কুকুর-বিড়ালের জন্যে থাকে মাইনে করা ম্যানেজার। এ নিয়ম স্বাভাবিকতার পরিপন্থী। তাই ইসলামে অসিয়ত করার ব্যাপারেও রাসুলের (সা.) দিক নির্দেশনা রয়েছে। কোন ব্যক্তি অসিয়ত করতে পারে তার সম্পত্তির সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, তার বেশী নয়। করলেও তা ইসলামী আইনে সিদ্ধ হবে না। এই অসিয়তও কার্যকর হবে মৃতের যদি কোন ঋণ বা কর্জ ও কাফফারা থেকে থাকে তবে তা পরিশোধের পর।

৯. রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত হস্তক্ষেপের বিধান

www.amarboi.org

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। অন্য সব অর্থনৈতিক বিবেচনাকে সামাজিক সুবিচার ও মূল্যনীতির আলোকেই বিচার-বিশ্লেষণ ও গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার ব্যাহত হতে পারে এমন কোন অর্থনৈতিক নিয়ম বা নীতি কার্যকর করতে বা থাকতে দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত হতে পারে না। এই উদ্দেশ্যেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে অবশ্যই 'মারুফ' বা সুনীতির প্রতিষ্ঠা এবং 'মুনকার' বা দুর্নীতির প্রতিরোধ করতে হবে। অর্থনীতিতে সুনীতি প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে সমস্ত উপায়ে সুবিচারমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলা। আর দুর্নীতি প্রতিরোধের অর্থ হচ্ছে সব ধরনের অর্থনৈতিক জুলুম ও শোষণের পথ বন্ধ করা।

সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও জুলুমের অবসানের জন্যে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সব আইন রচনা করতে পারে। এজন্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ক্ষমতা আল্লাহ্ আল-কুরআনেই প্রদান করেছেন। ইসলামী সরকার আইন প্রয়োগ করে অবৈধ উপার্জনের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিতে পারে, পারে সব ধরনের অনাচারের উচ্ছেদ করতে। এই উপায়েই রাষ্ট্র সুদ, ঘুষ, মুনাফাখোরী, মজুতদারী, চোরাচালান, কালোবাজারী, পরদ্রব্য আত্মসাৎ, সব ধরনের জুয়া, হারাম সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচলিত সব ধরনের অসাধুতা সমূলে উৎপাটন করতে পারে। রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের মাধ্যমেই যাকাত আদায় ও বিলি-বন্টন, বায়তুল মালের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, উত্তরাধিকার বা মীরাসী আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন, ইসলামী শ্রমনীতির রূপদান প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব।

রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তখন তাঁর সামনে কোন মডেল ছিল না। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁকে মডেল তৈরীতে সাহায্য করলেন জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে নির্দেশ পাঠিয়ে। সেই আলোকে তিনি গড়ে তুললেন নতুন এক সমাজ কাঠামো, অর্থনীতি ছিল যার অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। তিনি ঠিক করে দিলেন অর্থনীতির কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে অবশ্যই নজরদারী করতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। আবার প্রয়োজনে পূর্ণ সহযোগিতা নিয়েও এগিয়ে আসতে হবে।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে এমন কতকগুলি বিষয় রয়েছে যা ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া উত্তম, কিন্তু তার লাগাম রাষ্ট্রের হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়। যেমন উৎপাদন, বন্টন ও বিনিয়োগ। এগুলির যথাযথ তত্ত্বাবধান না হলে সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে, মুষ্টিমেয় লোকই সকল সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে। ফলে সাধারণ মানুষের দুর্গতির অন্ত রইবে না। মূলতঃ এই দৃষ্টিকোণ হতেই মানবতার অকৃত্রিম দরদী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উৎপাদনের পাশাপাশি তা

www.amarboi.org

থেকে গরীবদের হক আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন, ইয়াতীমদের যত্ন নিতে বলেছেন। তিনি ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণের জন্যে পৃথক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কৃষি জমি অনাবাদী ফেলে রাখার বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন।

আলোচ্য প্রসঙ্গে যে বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে রাসুল (সা.) হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তার কারণ ও ফলাফল পর্যালোচনা করা দরকার। সেগুলি হচ্ছে–

(১) উপার্জন;
(২) কৃষি;
(৩) শ্রমিক; এবং
(৪) ব্যবসা-বাণিজ্য।

উপার্জনঃ ইসলামী রাষ্ট্র অবশ্যই ব্যক্তির উপার্জনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। উপার্জনের পথ ও পদ্ধতি হালাল বা বৈধ হতে হবে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত সমস্ত সম্পদ ইসলামী সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে। কেননা সব অবৈধ পন্থাই হচ্ছে হারাম বা মুনকার এবং মুনকার নির্মূল করা ইসলামী সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সরকার সুদ, ঘুষ, জুয়া, কালোবাজারী, মজুতদারী, চোরাকারবারী ইত্যাদি সকল হারাম উপায়ে উপার্জনের পথ রুদ্ধ করে দেবে। সরকার এজন্যে আইনের কঠোর ও ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অপরদিকে যদি অন্যের জমি, সম্পত্তি বা অর্থ কেউ জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে আত্মসাৎ করে থাকে তবে তা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেবে। তা সম্ভব না হলে ঐ ধন-সম্পদ বায়তুল মালে জমা হবে। এমনকি কোন শাসনকর্তা বা সরকারী কর্মচারী পদের সুযোগ নিয়ে বিত্ত-সম্পত্তি করলে তাও সরকার বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। যদি এ কাজ না করা হয়, তবে সমাজে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার অব্যাহত থাকবে। পরিণামে তা রাষ্ট্র ও সমাজের অকল্যাণ ও মারাত্মক দুর্গতি ডেকে আনবে।

কৃষিঃ কৃষির স্বার্থে বর্গাচাষের শর্ত ও পদ্ধতির কারণে কৃষক যেন অত্যাচারিত না হয় সে বিষয়ে রাসুল (সা.) সবিশেষে সতর্ক থাকতে বলেছেন। উপরন্তু জমি যেন অনাবাদী ও পতিত পড়ে না থাকে সে ব্যবস্থা করা সরকারেরই দায়িত্ব। জমির উৎপাদন ক্ষমতা, পরিমাণ ও গুণাগুণের ভিত্তিতে খারাজ জনগণের জন্যে দুর্বিষহ ভারের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিনা তাও যাচাই করে দেখতে হবে সরকারকেই। কৃষির প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে কৃষককে সাহায্য করা দরকার। কৃষিপণ্যের বাজার, মূল্য ও সরবরাহের উপরও সরকারের নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। তা না হলে বাজারে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের সরবরাহ যেমন অনিশ্চিত হবে তেমনি

www.amarboi.org

কৃষকও তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায়সঙ্গত দাম হতে বঞ্চিত হবে। তাছাড়া মূল্য বেড়ে গিয়ে জনগণেরও অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে।

সরকারের অপর অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে মীরাস বা উত্তরাধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য করা। বিশেষতঃ ইয়াতীম ও স্ত্রীলোক এই বিধানের সুফল পাচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। বর্তমান সমাজে ন্যায্য প্রাপ্য হতে ওয়ারিশরা প্রায়ই বঞ্চিত হয়। সৎভাই-বোনেরা পিতার সম্পত্তি হতে বিতাড়িত হয়। এর কারণ মীরাসী আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাব। এ ব্যাপারে সরকারকে অবশ্যই কঠোর হতে হবে। পক্ষপাতহীন শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবল এই দুর্নীতি দমন করা সম্ভব। অসিয়ত ও ওয়াকফকৃত জমি যেন সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে সরকারকেই।

শ্রমিকঃ রাসুলের (সা.) নির্দেশের প্রেক্ষিতে একথা বুঝতে বাকী থাকার কথা নয় যে ইসলামী সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় নিশ্চিত করা। তাদের উপর যাতে জুলুম না হতে পারে তার যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শ্রমিকদের মজুরী যেন তাদের জীবন-যাপনের জন্যে উপযুক্ত হয় তা দেখাও সরকারের দায়িত্ব। শ্রমিকদের জন্যে সরকার একটা নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ করে দেবে। শিল্পমালিকরা এই মজুরী দিতে বাধ্য থাকবে। বাস্তবতার আলোকেই সরকার শ্রমিকদের অন্যান্য সুবিধা দানের ব্যবস্থা সম্বলিত আইন প্রণয়ন করবে। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা, বোনাস ইত্যাদির সুবিধাও এই আইনে থাকবে। এসব আইনের উদ্দেশ্য হবে শ্রমিকদের সত্যিকার স্বার্থ রক্ষা করা।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ ব্যবসায়ের সব অবৈধ ও অন্যায় পথ এবং প্রতারণামূলক কাজ নিষিদ্ধ করাই শুধু ইসলামী সরকারের দায়িত্ব নয় বরং তা যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তাও দেখা কর্তব্য। *ইহ্‌তিকার* অর্থাৎ অধিক লাভের আশায় পণ্য মজুদ রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। ধোঁকাবাজি করা অন্যায়। ভেজাল দেওয়া যে কোন বিচারেই মারাত্মক অপরাধ। ওজনে কারচুপিও তাই। এ সমস্তই প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। না হলে জনসাধারণ ক্রমাগত ঠকতে থাকবে। এর প্রতিবিধানের জন্যে *হিস্‌বাহ* নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়েছিল। এ থেকেই উপলব্ধি করা যায় সমাজকে তথা মানব চরিত্রকে কত গভীরভাবে রাসুলে করীম (সা.) পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

রাসুলে করীম (সা.) মাঝে মাঝেই বাজার পরিদর্শনে যেতেন। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ে দোকানদারদের কার্যক্রম লক্ষ্য করতেন। এ থেকেই বোঝা যায় বাজার

www.amarboi.org

ব্যবস্থার উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যও বটে। পরবর্তীকালে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারুকও (রা.) একাজ করতেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাজার যেন স্বাভাবিক নিয়মে চলে। মজুতদারী, মুনাফাখোরী, ওজনে কারচুপি, ভেজাল দেওয়া, নকল করা প্রভৃতি বাজারে অনুপ্রবেশের সুযোগ না পায়। পণ্যসামগ্রীর অভ্যন্তরীণ চলাচলের উপর বিধি-নিষেধ থাকবে না। কারণ, খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর অবাধ চলাচলের উপর বাধা-নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপের ফলেই কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি হয় ও দুর্নীতির পথ প্রশস্ত হয়। তাই বাজার নিয়ন্ত্রণ ও দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক করার জন্যে সরকারকে সুষ্ঠু ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১০. সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন

যেকোন উত্তম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচায়ক হচ্ছে তার সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্যে গৃহীত ব্যবস্থা। প্রচলিত সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শে এজন্যেই সমাজকল্যাণের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সেসবের কোনটিই ইসলামের সমকক্ষ নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামেই জনকল্যাণের জন্যে সর্বপ্রথম সর্বাত্মক জোর ও সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে শুধু আল-কুরআন ও হাদীস শরীফে যে নির্দেশ রয়েছে তার যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলে গোটা সমাজব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হওয়া সম্ভব। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জনগণের জন্যে যতটুকু না করলেই নয় বা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আপন আপন মর্জি-মাফিক যতটুকু করতে ইচ্ছুক ততটুকুই মাত্র জনসাধারণ পেতে পারে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে একদলীয় সরকারের নিজস্ব নীতি ও প্রয়োজন অনুসারে জনকল্যাণমূলক নীতি গৃহীত হয়ে থাকে। এর কোনটিই পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু হতে পারে না।

জনকল্যাণের জন্যে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ছাড়াও ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ব্যক্তিকেও নিজস্ব সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী এগিয়ে আসতে হবে। ব্যক্তির ধন-সম্পত্তিতে অন্যেরও হক বা অধিকার রয়েছে। ইসলামেই সর্বপ্রথম ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-

"তুমি আত্মীয়-স্বজন ও গরীব এবং পথের কাঙালগণকে তোমার নিকট হতে তাদের পাওনা দিয়ে দাও।" (সুরা বনি ইসরাইল ঃ ২৬ আয়াত)

রাসুলে করীম (সা.) বলেছেন-
"তোমাদের ধন সম্পদে (যাকাত ছাড়াও) সমাজের অধিকার রয়েছে।"

(তিরমিযী)

www.amarboi.org

উপরের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন ব্যক্তির উপার্জিত অর্থে তার নিজের ছাড়াও আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের অন্যান্য অভাবগ্রস্তদের অধিকার রয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি প্রয়োজনের চেয়ে কম উপার্জন করে তাহলে সামর্থ্য অনুযায়ী ঐ আত্মীয়কে সাহায্য করা ধনী আত্মীয়ের সামাজিক দায়িত্ব। আত্মীয়দের মধ্যে কেউ এমন না থাকলে প্রতিবেশী বা পরিচিতদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত বা প্রয়োজন পূরণে অক্ষম ব্যক্তিকে সাহায্য করা ঐ ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। এমন ব্যাপকভাবে প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নির্দেশ পৃথিবীর আর কোন ধর্মে বা মতাদর্শে ইসলামের পূর্বেও দেওয়া হয়নি, পরেও না। বস্তুতঃ এই নির্দেশের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা ও সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব অনুভূতির প্রেরণা রয়েছে।

জনকল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্যে ও সমাজের সাধারণ মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের জন্যে রাসুল (সা.) দুটি বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন- যাকাত ও বায়তুল মাল। যাকাত কারা দেবে, কিভাবে তা আদায় হবে এবং কারা যাকাতের হকদার সে সম্পর্কে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে বায়তুল মাল সৃষ্টির উদ্দেশ্য, এর অর্থাগমের উৎস ও ব্যয়ের খাত প্রভৃতি সম্বন্ধেও বলা হয়েছে। ইসলামী সমাজে বায়তুল মাল ও যাকাত একযোগে যে বিপুল সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ করতে পারে এবং দুঃস্থ, দারিদ্রপীড়িত, অক্ষম, বৃদ্ধ, পঙ্গু, বিধবা ও ইয়াতীম শিশুদের যে আর্থিক নিরাপত্তা দিতে পারে তা আর কোনভাবেই সম্ভব নয়। ইসলামপূর্ব যুগের কোন সমাজে তা ছিল না, এখনও নেই। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন লোক দেখানোর জন্যে সমস্যার সাময়িক উপশম করতে পারে বটে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণ সাধন হয় না। স্বেচ্ছায় মানুষ যখন কোন কাজে সাড়া দেয় এবং অংশগ্রহণ করে তখন যে দুর্বার শক্তির সৃষ্টি হয় তার মুখে কোন বাধাই যেমন বাধা নয়, তেমনি কোন কাজই কঠিন নয়।

যাকাত ও বায়তুল মাল ছাড়াও মীরাসী আইনের প্রয়োগ, মানবিক শ্রমনীতির প্রবর্তন, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, করযে হাসানার বিধান এবং উপার্জন ভোগ-বন্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রে হালাল-হারামের পার্থক্য নির্দেশ একদিকে বহু সামাজিক অনাচারের পথ যেমন চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ ও জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণ ও উন্নয়নের পথ সুগম ...ছে। বস্তুতঃ উপরোক্ত বিষয়গুলির সমষ্টিফলই হচ্ছে একটি সুখী, অভাবমুক্ত ও ...লী সমাজ। আইয়ামে জাহেলিয়াত ও তার পূর্ববর্তী সমাজ ব্যবস্থাসমূহ

www.amarboi.org

হতে ক্রমে ক্রমে যে পঙ্কিলতা ও অনাচার অর্থনীতিতে সংক্রমিত হয়েছিল সেসব দূর করার জন্যেই আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের নির্দেশিত পথে রাসুলে করীম (সা.) কাজ করে গেছেন। তাঁর সে পথ অনুসরণ করেছেন মহান খুলাফায়ে রাশেদীন (রা.)। ফলে অর্থনীতিতে সূচিত হয়েছিল বিপ্লব। প্রয়োগ ও সাফল্যে সৃষ্টি হয়েছিল উন্নয়নের গতিবেগ। তারই সুদূরপ্রসারী ফল হিসাবে এক সুখী ও সমৃদ্ধশালী, সাহিত্য-শিল্পকলা ও বিজ্ঞানে উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল।

উপসংহার

উপরের আলোচনা হতে একথা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যায় যে মানবতার বন্ধু, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী এবং সফলতম সমাজ সংস্কারক হযরত মুহাম্মদ (সা.) মাত্র দশ বছরের প্রচেষ্টায় সমকালীন অর্থনীতিতে এমন পরিবর্তন এনেছিলেন যা ছিল এক কথায় অনন্য। তিনি অর্থনীতিতে এমন দশটি দফার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন যা ছিল অশ্রুতপূর্ব। এই কর্মসূচীর মাধ্যমেই তিনি একদিকে অত্যাচার ও শোষণের পথ রুদ্ধ করেছিলেন, অন্যদিকে সমষ্টি মানুষের জীবনে কল্যাণ ও মঙ্গলের সুবাতাস বইয়ে দিয়েছিলেন। দাসভিত্তিক অর্থনীতির মূলে তিনি কুঠারাঘাত করেছেন, বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন উৎখাত করেছেন, অবৈধ পথে উপার্জনের মাধ্যমে বিপুল বিত্তের মালিক হয়ে সাধারণ লোকের উপর ছড়ি ঘোরাবার পথ রুদ্ধ করেছেন, সুদের মত ঘৃণ্য প্রথার মাধ্যমে জোঁকের মত সমাজদেহ হতে জীবনীশক্তি শুষে নেবার পথ ধ্বংস করেছেন। এরই পাশাপাশি যাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিটি নাগরিকের আর্থিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে আপামর জনসাধরণের জীবনে যে স্বস্তি ও নিরাপত্তা বিধান করেছেন সমকালীন বিশ্ব ইতিহাসে তার তুল্য কোন নজীর নেই।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর সঙ্গে তুর পাহাড়ে সাক্ষাৎ করতে গেলে তাঁর কাছ থেকে দশ দফা নির্দেশ পেয়েছিলেন। খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে এই দশ দফা নির্দেশ বা Ten Commandments-এর উল্লেখ রয়েছে। এরপর দীর্ঘ সময় পরিক্রমায় নানা জনে অর্থনীতি, রাজনীতি, সম নানা ধরনের কর্মসূচী দিয়েছেন, সমাজ জীবনের কোন-না-কোন f উন্নয়নের জন্যে দিয়েছেন নানা দফা বা দিক নির্দেশনামূলক প্রস্তা রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক, অর্থনীতিবিদ তাদের প্রস্তাবিত

www.amarboi.org

জীবদ্দশায় দেখে যাওয়া দূরে থাক সেসবের বাস্তবায়ন পর্যন্ত করে যেতে পারেননি। কিন্তু আল্লাহর হাবীব ছিলেন পৃথিবীর সকল কালের সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সফল রাষ্ট্রনেতা এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি যে দশ দফা কর্মসূচীর ঘোষণা দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়নও করে দেখিয়েছেন। এখানেই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, তাঁর অসাধারণ সাফল্য।

বিশ্বের বঞ্চিত নির্যাতিত মানুষ তাঁর গৃহীত অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে যে শোষণমুক্ত নবজীবন লাভ করেছিল, have nots আর have দের যে দূরতিক্রম্য ব্যবধান অপসারিত হয়েছিল, রাষ্ট্রেরই পক্ষপুটে অসহায়দের আশ্রয়ের যে অভাবিত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর আর কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই তার কোন নজীর নেই। পরিতাপের বিষয়, আজকের মুসলমান আত্মভোলা, নিজেদের ইতিহাস বিস্মৃত। সে বিজাতীয় জীবনাদর্শ ও কর্মকৌশল আকঁড়ে ধরে ভুল পথে উন্নতি লাভের চেষ্টা করছে। ফলে না তার ইহজাগতিক উন্নতি হচ্ছে, না তার আখিরাতের জীবনের কল্যাণ হচ্ছে। এই অবস্থা হতে পরিত্রাণ পেতে হলে নিজেদের স্বকীয়তা নিয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে, সামনে এগুবার জন্যে সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। রাসুলের (সা.) দশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তার পক্ষে সম্ভব ইহজাগতিক কল্যাণ লাভ করা আর আখিরাতে আল্লাহর নিকট হতে পুরস্কৃত হওয়া। এজন্যে একমাত্র রাসুল (সা.) প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থা অনুসরণেই তার মুক্তি — এই বোধ-বিশ্বাসে তাকে উজ্জীবিত হতে হবে। তবেই ইহকালীন সাফল্যের সাথে নিশ্চিত হবে তার পারলৌকিক মুক্তি। মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সেই পথে পরিচালিত করুন। আমীন !

www.amarboi.org

www.icsbook.info

www.amarboi.org